# না-মানুষের পাঁচালী



নারায়ণ সান্যাল

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

# কৈফিয়ত

কাহিনীগুলির 'আমি' কিন্তু বর্তমান লেখক নন। বিভিন্ন না-মানুষ-প্রিয় মানুষের ভূমিকায় 'আমি' অভিনয় করে গেছেন।

'না-মানুষের কাহিনী', 'পদ্মপত্রবিহারিণী' এবং 'পিতৃত্বের দায়'-এর 'আমি' হচ্ছেন জেরাল্ড ডারেল (Gerald Durrell)। তাঁর 'Encounters with Animals' এবং অন্যান্য বই থেকে গল্পের মূল কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যদিও নানান জীববিজ্ঞানের গ্রন্থ থেকে আরও তথ্য যুক্ত করেছি। এক সময় টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট এঁর সম্বন্ধে বলেছিল, 'If animals, birds and insects could speak, they would possibly award Mr G. Durrell one of their first Nobel Prizes.'

'পেটুক' গল্পের 'আমি' হচ্ছেন ডি লরেন্স। তাঁর মূল কাহিনীটির নাম—'Paddy : A Naturalist's Story of an Orphan Beaver'.

কোন কাহিনীই অনুবাদ করিনি, কাহিনীগুলি অবলম্বনে বঙ্গভাষাভাষী পাঠকের উপযুক্ত করে পরিবেশনের চেষ্টা করেছি।

নরনারীর জীবনের এক বিশেষ পর্যায় অনুল্লেখিত থাকাই যদি কিশোর-সাহিত্যের সংজ্ঞা হয়, তবে এটি কিশোরপাঠ্য বই। আমি কিন্তু বিভূতিবাবুর 'চাঁদের পাহাড়', শরৎবাবুর 'মহেশ' এবং জ্যাক লন্ডনের Call of the Wild অথবা White Fang-কে কিছুতেই কিশোর-সাহিত্য বলে মেনে নিতে পারি না। অপরপক্ষে 'হোয়াইট ফ্যাঙ'-এ নেকড়ে নায়কের সঙ্গে কোলি-কুত্তির রোমান্সের বর্ণনার অপরাধে সেটি কিশোরপাঠ্য নয়—এ-কথাও মানা চলে না। প্রসঙ্গত বলি, অন্যান্য গল্প কিশোর-বার্ষিকীতে প্রাকাশিত হলেও 'না-মানুষ বিজ্ঞানী' আত্মপ্রকাশ করেছিল পূজা-সংখ্যা 'প্রমা' পত্রিকায়। ওর রস শুধুমাত্র কিশোরদের উপযোগী মনে করলে সম্পাদক অধ্যাপক পবিত্র সরকার মশাই নিশ্চয় রচনাটি প্রত্যাখ্যান করতেন।

তবু পাঠক-হিসাবে আমার মনশ্চক্ষে নিশ্চয় উপস্থিত ছিল অল্পবয়সীরা। তাই পাঠক-পাঠিকাকে আমি সর্বত্র 'তুমি' সম্বোধন করেছি।

নারায়ণ সান্যাল

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| না-মানুষ বিজ্ঞানী | ১১ |
| পদ্মপত্রবিহারিণী | ৩১ |
| পেটুক | ৪৯ |
| পিতৃত্বের দায় | ৬৫ |

# না-মানুষ বিজ্ঞানী

একবার আমি আফ্রিকা থেকে নানান খাঁচা-ভর্তি জীবজন্তু নিয়ে ফিরছি—উটপাখি, জিরাফবাচ্চা থেকে শুরু করে কাঁকড়া-বিছে, বাদুড়, মাকড়শা—কী নেই আমার হেপাজতে? শ-দুয়েক খাঁচা, তাদের খাদ্য ও ঔষধপত্র মিলিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড! এই প্রকাণ্ড বাহিনীর যথোপযুক্ত খিদমৎ করতে দুজন আফ্রিকানও চলেছে আমার সঙ্গে, বিল আর জর্জ। যে জাহাজে ফিরছি তার নাম 'সী-কুইন' এবং তার ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন আইরিশম্যান, ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌গ্রেগরি। ভদ্রলোক জন্তু-জানোয়ার একদম বরদাস্ত করতেন না। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। দু তরফেই। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আমার ভাগ্যটাই বেশি খারাপ। কারণ আমি তাঁর ঔদাসীন্য, এমনকি ঘৃণাটাও হজম করে নিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা পারেননি। প্রায়ই নানান ছুতোয় ক্যাপ্টেন-সাহেব তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করতেন, সুযোগ পেলেই জানিয়ে দিতেন এইসব মনুষ্যেতর সহযোগী তাঁর জাহাজে চড়ায় তিনি ক্ষুব্ধ।

আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতুম। প্রথম কথা, আইরিশম্যানের সঙ্গে তর্ক করা বারণ! কেন জান? তুমি যদি ঘটি হও তাহলে কাঠবাঙালদের এড়িয়ে চলবে; আর যদি ইস্টবেঙ্গল-সাপোর্টার হও তাহলে কট্টর মোহনবাগান-ফ্যানকে শতহস্ত দূরে রাখবে। তা চাণক্যপণ্ডিত বলুন না-বলুন। দ্বিতীয় কথা, লোকটা জাহাজে সর্বময় কর্তা—কে জানে কোন ছুতোয় বিপদে জড়িয়ে পড়ব। য়ুরোপের নানান চিড়িয়াখানার জন্য সংগৃহীত এই অ্যাত্তগুলি জীবকে নিয়ে এমনিতেই আমি নানাভাবে বিব্রত। তবু জাহাজ যখন ইংলন্ড-উপকূলের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন মনে হল ঐ ভদ্রলোককে একটু শিক্ষা দিতে পারলে মন্দ হয় না।

ঘটনাচক্রে তিনি নিজেই সে সুযোগটা করে দিলেন। জাহাজ তখন ইংলিশ

চ্যানেলের দোর-গোড়ায়। বাইরে প্রচণ্ড বর্ষণ, তাই 'ডেক' ছেড়ে সবাই জড়ো হয়েছি ধূমপান-কক্ষে। টেলিভিশনে তখন 'রেডার'-যন্ত্র বিষয়ে একটা তথ্যমূলক প্রোগ্রাম হচ্ছে। কীভাবে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ইলেক্‌ট্রোমাগ্‌নেটিক-তরঙ্গ ছুঁড়ে রেডার চোখবুজে বলে দিতে পারে অদৃশ্য বস্তুটা কত দূরে আছে। রেডার যন্ত্রটা সে আমলে নতুন বলে সবাই মন দিয়ে শুনছে ; প্রোগ্রাম শেষ হতেই ক্যাপ্টেন আমার দিকে ইঙ্গিত করে ববকে বললেন, ইনি মনে করেন জীবজন্তুরা খুব চালাক। মানুষ যেমন আজ রেডার বানিয়েছে তেমনি বিবর্তনের মাধ্যমে আজ থেকে এক কোটি বছর পরে কোনো জন্তু রেডার আবিষ্কার করবে।

আমি দেখলুম, ভদ্রলোক আমার কব্জায়।' নির্লিপ্তভাবে বলি, তা যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে কত টাকা বাজি হারবেন?

যেন জবর রসিকতা করেছি আমি। ক্যাপ্টেন অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, আজ থেকে এক কোটি বছর পরে কোনো মনুষ্যেতর জীব যে রেডার যন্ত্রটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে এটা প্রমাণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। তাই হাসতে হাসতে বললেন, এক বোতল ম্যাগ্‌নাম-সাইজ হোয়াইট হর্স হুইস্কি।

আমাদের টেবিলে আমরা ছিলুম পাঁচজন। আমি তাঁদের দিকে ফিরে বলি, আপনারা সাক্ষী রইলেন কিন্তু।

বব ওদের মধ্যে দারুণ ফুর্তিবাজ। তার চোখেমুখে কথা। আগ্‌ বাড়িয়ে বললে, সাক্ষী থাকতে রাজি আছি, যদি শ্বেতাশ্বের ছিটেফোঁটার প্রতিশ্রুতি পাই।

আমি ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলি, ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌গ্রেগরি, ঐ সঙ্গে যদি আমি প্রমাণ দিই জীবজন্তুরা রেডারের মতো ইলেকট্রিসিটি, আর্দেন-ড্যাম, ডাইভিং বেল এবং ফ্রেজিডিয়ারও বানাতে পারবে তাহলে আপনি কি আমার বন্ধুদেরও এক-এক বোতল হোয়াইট হর্স হুইস্কি উপহার দেবেন?

ম্যাক্‌গ্রেগরি আমার এ পাগলের প্রলাপে উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ে। বলে আলবাৎ! তবে প্রমাণ দিতে না পারলে আপনাকে দিতে হবে পাঁচ বোতল মদ! কী? রাজি?

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলি, আই অ্যাক্‌সেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ!



ম্যাক্‌গ্রেগরি আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, ও. কে.!

আমাদের শেষদিকের বাক্যবিনিময় কিছু উচ্চকণ্ঠে হয়ে থাকবে, কারণ অনেকেই ঘনিয়ে এলেন জানতে, বাজিটা কী নিয়ে!

ম্যাক্‌ বলে, কিন্তু এ বিতর্কের বিচারক হবে কে?

বব বলে, কেন? আমি! এ তো সহজ বিচার! যেই হারুক, বিচারক এক বোতল হুইস্কি পাবে।

ম্যাক্‌ বলে, সেই জন্যই তোমাকে বিচারক করা চলবে না। এমন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক চাই যিনি চুলচেরা বিচার করবেন! বসো, আমি আসছি...

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ম্যাক্‌ ফিরে এল। তার সঙ্গে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, জেন্টলমেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য, স্যার ডোনাল্ড লরেন্স এ জাহাজের যাত্রী। উনি রিটায়ার্ড চিফ্‌ জাস্টিস্‌ ; তার চেয়েও বড় গুণ—উনি টিটোটালার, অর্থাৎ মদ্য স্পর্শ করেন না। হারজিৎ সমান-সমান হলেও তিনি নির্দ্বিধায় তা ঘোষণা করার হিম্মৎ রাখেন!

ইতিমধ্যে খবরটা মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ, ভিতরে নিষ্কর্মা অলস যাত্রী। জাহাজ এগিয়ে চলেছে একটানা। নতুন খেলার গন্ধে সবাই ঘনিয়ে আসে। হাতাহাতি করে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে এটাকে একটা মেকি আদালতের রূপ দেয়। মাঝখানে স্যার লরেন্সের বিচারাসন। তাঁর সামনে টেবিলে কোনো ফোরম্যানের কাছ থেকে হাতিয়ে আনা একটা হাতুড়ি। চিফ স্টুয়ার্ড সাজল নকিব, নেভাল এঞ্জিনিয়ার পেশকার। বিচারকের দুই প্রান্তে আমরা দুই কাউন্সেলার, ম্যাক্‌গ্রেগরি ও আমি। মায় যারা পোকার খেলছিল তারাও তাস ফেলে এগিয়ে আসে!

স্যার লরেন্স রগুড়ে মানুষ ; মজা পেয়ে হাতুড়িটা টেবিলে ঠুকে হাঁক পাড়েন : অর্ডার! অর্ডার!

সবাই সামলে-সুমলে বসে। বাক্যালাপ বন্ধ হয়।

জজ বলেন, 'সী-কুইন' আদালতে শুনানি শুরু হচ্ছে। কেউ গণ্ডগোল করবেন না। এক নম্বর মামলা—মানুষ বনাম না-মানুষ।

ম্যাক্‌গ্রেগরি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, অজ্ঞে না ধর্মাবতার, মামলাটা ম্যাকগ্রেগরি ভার্সেস্‌ ডারেল!

জজ তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন ; য়ূ শাট আপ! আদালতের কাজে বিঘ্ন করলে আদালত অবমাননার দায়ে তোমাকে চ্যাঙ্‌দোলা করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে—

পেশকার ফোড়ন কাটে ; বিনা লাইফ বেল্টে!

নকিব ফুটনোট দাখিল করে, বেছে বেছে সমুদ্রের যেখানে মানুষখেকো হাঙরের ঝাঁক।

ম্যাক্‌গ্রেগরি থতমত খেয়ে বসে পড়ে।

জজ-সাহেব বলেন, বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষে কাউন্সেলাররা হাজির?

নকল-নকিব চিফ স্টুয়ার্ড যেন তার অদৃশ্য নথি দেখে বলল, ইয়েস য়োর অনার! বাদীর পক্ষে আছেন অ্যাডভোকেট ম্যাক্‌গ্রেগরি বিবাদী পক্ষে জি. ডারেল, বার-অ্যাট-ল।

এতক্ষণে খেলার কানুনটা মালুম হল ম্যাক্‌গ্রেগরির। উঠে দাঁড়িয়ে নিখুঁত কায়দায় 'বাও' করে বললে, ইয়েস্ য়োর অনার! মানুষের তরফে আমি ওকালৎনামা পেয়েছি।

জজ গম্ভীরভাবে বলেন, ইজ দ্য ডিফেন্স রেডি অ্যাজ ওয়েল?

আমি বাও করে বলি, ডিফেন্স ইজ অলওয়েজ রেডি মি-লর্ড!

জজ বললেন, মিস্টার প্রসিকিউটিং কাউন্সেল! আপনি কি একটি প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে ইচ্ছুক?

ম্যাক্ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবজন্তুরা স্বভাবতই নির্বোধ। যেমন গাধা, যেমন গরু, যেমন উল্লুক। মানুষের যখন বুদ্ধি কম থাকে তখন আমরা তাকে ঐসব নামে বিভূষিত করি—গাধা-গরু-বাঁদর-উল্লুক। কিন্তু এই জাহাজে জনৈক মনুষ্যেতর জীবের দরদী—

—অবজেকশন, য়োর অনার!—আমি আপত্তি দাখিল করি।

জজ বলেন, অন হোয়াট গ্রাউন্ডস্? কী কারণে আপনার আপত্তি?

—'মনুষ্যেতর' শব্দটা ইর্‌রেলিভ্যান্ট, ইনকম্‌পিট্যান্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল। নো ফাউন্ডেশান হ্যাজ বিন লে'ড! মানুষের চেয়ে না-মানুষরা 'ইতর' কি না সেটাই তো এ মামলার বিচার্য বিষয়!

জজ গম্ভীর হয়ে বললেন, অবজেকশন সাসটেইন্‌ড।

একটা ঢোঁক গিলে ম্যাক বলে, বেশ, না হয় 'মনুষ্যেতর' শব্দটা আপাতত



ব্যবহার করলুম না। আমি বলতে চাই, বিপক্ষ দলের কাউন্সেল যে এই অমানুষদের—

আবার খাড়া হই আমি : অবজেকশান য়োর অনার! 'অমানুষ' শব্দটাতে এমন একটি 'যোগরূঢ়' ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়েছে যাতে সেটা শুধু খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ও শব্দটা চলবে না।

জজ সংক্ষেপে বলেন, সেম রুলিং! ও শব্দটা চলবে না।

ম্যাক্ শ্রাগ করে বলে, যাচ্চলে! তাহলে তোমার ঐ 'ওনাদের' কী নামে ডাকব?

জজ বলেন, 'না-মানুষ' নামে।

—তা বেশ, তাই সই। এ জাহাজের যাত্রী মিস্টার জি. ডারেল বলছেন, ঐ না-মানুষেরা এক কোটি বছরের মধ্যে মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তারা ডাইভিং বেল, ইলেকট্রিসিটি, আর্দেন ড্যাম, ফ্রিজিডেয়ার এবং রেডার-যন্ত্র আবিষ্কার করবে। এটা তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করবেন। যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমি পাঁচ বোতল ম্যাগ্‌নাম-সাইজ হোয়াইট হর্স হুইস্কি বাজি হারব। যদি প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে তিনি তাই হারবেন।

জজ বলেন, আমি এই মুহূর্তেই মামলা ডিস্‌মিস করে দিতাম। আজ থেকে এক কোটি বছর পরে কী হতে পারে, না পারে সেটা কোনো বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে না। জুডিশিয়ারির কেরামতি শুধু অতীত নিয়ে। ফলে এ মামলা এখানেই ডিস্‌মিস্ হওয়ার যোগ্য। তবু যেহেতু আমি একপক্ষের সওয়াল শুনেছি, তাই আমি অপরপক্ষের সওয়ালও শুনব। অ্যাডভোকেট ডারেল, আপনি কিছু বলবেন?

—বলব, মি লর্ড! আমি বলতে চাই, এক কোটি বছর পরে কী হতে পারে সেটা প্রমাণ না করে যদি আমি প্রমাণ করি—না-মানুষেরা ইতিমধ্যেই ঐ আবিষ্কারগুলি করেছে, তাহলে—

জজ সাহেব ঝুঁকে পড়ে বলেন, তার মানে আপনি বলতে চান, না-মানুষেরা ঐ পাঁচটি আবিষ্কার ইতিমধ্যেই করেছে, এটা আপনি প্রমাণ করবেন?

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ ধর্মাবতার।

ম্যাক আগ্ বাড়িয়ে বললে, তাহলে পাঁচ বোতল নয় হুজুর, এ জাহাজের সবাইকে আমি আজ সান্ধ্য-কক্‌টেল পার্টিতে নিমন্ত্রণ করছি—যে যত ইচ্ছে

মদ গিলবেন। বিল মেটাবার দায় আমার!

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে : ব্রেভো! ব্রেভো!

জজ আমার দিকে ফিরে বলেন, আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

আমি বলি, নিমন্ত্রণ তো হয়েই গেছে ধর্মাবতার! মামলায় হারলে বিলটা না হয় আমিই মেটাবো।

দর্শকের সারিতে এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তার মানে কি স্বয়ং জজসাহেব আজ সন্ধ্যায় আকণ্ঠ স্কোয়াশ গিলবেন!

শুনলাম, তিনি লেডি লরেন্স, বিচারকের ধর্মপত্নী! স্যার লরেন্স টেবিলে হাতুড়িটা ঠুকে বললেন, অর্ডার! অর্ডার!

অতঃপর শুরু হল আমার সওয়াল।

—ধর্মাবতার! আমার এক নম্বর সাক্ষী মহাবিজ্ঞানী শ্রীমান বাদুড়েশ্বর বিহঙ্গোপম!

নকিবেশী চিফ স্টুয়ার্ড বেইলি কায়দামাফিক হাঁক পাড়ল : এক নম্বর সাক্ষী বাদুড়গোপাল হা—জি—র?

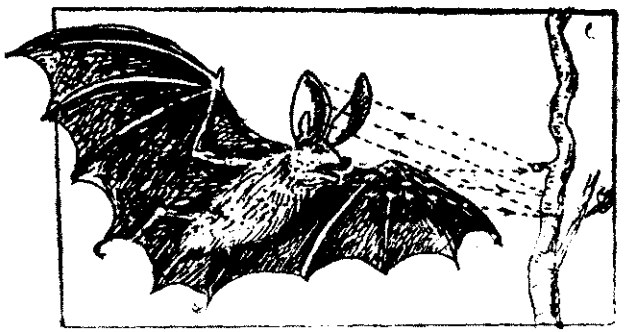

*'বাদুড়েশ্বর বিহঙ্গোপম'*

তৎক্ষণাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বিল্। আমার আফ্রিকান ভৃত্য। জন্তুজানোয়ারের খিদমৎ করতে করতে যে-ছোকরা আমার সঙ্গে চলেছে। তার হাতে একটা খাঁচা।

সাক্ষী যে সশরীরে হাজির হবে এটা কেউই আশঙ্কা করেনি। আমি বললুম,



আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, ছোটাছুটি করবেন না। চুপচাপ বসে সার্কাস দেখুন।

বাদুড়েশ্বরের পায়ে একটা হালকা অথচ মজবুত নাইলনের সুতো বাঁধা ছিল। ছেড়ে দিতেই সে বাতাসে উড়ল। আমার সাবধানবাণী সত্ত্বেও কয়েকজন মহিলা টেবিলের তলায় সেঁদিয়ে গেলেন ; দু-একটা মর্মবিদারক ইন্টারজেক্শনও শোনা গেল এখানে-ওখানে। বাদুড়েশ্বর হল-কামরার এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত বার কয়েক পারাপার করল। অনেকগুলি বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছিল, সে কোথাও ঠোক্কর খেল না ; এরপর আমার নির্দেশে বিল্ সুতো ধরে টেনে ওকে নামালো, খাঁচায় পুরলো।

আমি পুনরায় সওয়াল শুরু করি, ধর্মাবতার, যে-খেলাটা আমার এক নম্বর সাক্ষী দেখালো সেটা সে নীরন্ধ্র অন্ধকারে চোখ বেঁধেও দেখাতে পারে। বিশ্বাস হয় না হয়, ঘরের সব বাতি নিবিয়ে দিয়ে টর্চ হাতে প্রতীক্ষা করুন।

একাধিক মহিলা সমস্বরে বলে ওঠেন, আমরা মেনে নিলাম! কী বলেন ক্যাপ্টেন সাহেব?

ম্যাক্ বলে, হ্যাঁ, অন্ধকারেও ওরা ধাক্কা খায় না আমি লক্ষ্য করেছি; কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হল?

আমি বলি, এ থেকে প্রমাণ হল যে, বাদুড় রেডার-এর ব্যবহার জানে!

ম্যাক্ খিঁচিয়ে ওঠে ; ইল্লি। মাম্‌দোবাজি নাকি? হাও?

—অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বাদুড়ের চোখ নেই। সেটা ঠিক নয়; চোখ ওদের আছে ; তবে খুব ছোট ছোট। লোমে ঢাকা থাকে বলে সহজে নজরে পড়ে না। সে চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ নয় যে, এমন ম্যাজিক সে দেখাতে পারে। তাহলে সে কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করে? ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের অন্যতম অসামান্য ধ্বজাধারী লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলেছিলেন, মানুষ যদি কোনোদিন আকাশে ওড়ে তবে সে পাখির মতো উড়বে না, বাদুড়ের মতো উড়বে। অন্য কোনো বিহঙ্গ নয়, স্তন্যপায়ী বাদুড়ই হবে উড্ডয়ন-বিদ্যায় মানুষের একমাত্র আদর্শ! তার আরও দুশ বছর পরে জীব-বিজ্ঞানী স্প্যালাঞ্জানি—তিনিও ইতালীয়, লেঅনার্দোর দেশের মানুষ, খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন বাদুড় কীভাবে ধাক্কা না-খেয়ে এমনভাবে উড়তে পারে। আর সবাই নীরন্ধ্র অন্ধকারে দেওয়ালে ধাক্কা খায়, বাদুড় খায় না। কেন?

তিনি কয়েকটি বাদুড়কে চোখ বেঁধে উড়িয়ে দিলেন। দেখলেন, তা সত্ত্বেও তারা ঐভাবে উড়তে পারছে। দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে না। উড়ন্ত সেই অন্ধ বাদুড়ের দিকে ছাতা-জুতো ছুঁড়ে তাকে আহত করা যাচ্ছে না—সে ঠিকই পাশ কাটিয়ে সরে যেতে পারছে। কিন্তু কীভাবে? স্প্যালাঞ্জানি তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। শুধু তিনি নন, আরও দুশ বছর ধরে কোনো জীববিজ্ঞানীই এই সমস্যার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

তারপর বর্তমান শতাব্দীতে 'রেডার' আবিষ্কৃত হল। রেডার কী? এই যন্ত্রের সাহায্যে চতুর্দিকে কিছু বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোনো কিছুতে প্রতিহত হয়ে সে ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক-ওয়েভ যখন ঐ যন্ত্রে ফিরে আসে তখন যান্ত্রিক নির্দেশে বলে দেওয়া যায়, যে-বস্তুতে প্রতিহত হয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গটা ফিরে এসেছে সেটা কত দূরে। এই রেডার আবিষ্কৃত হতেই একদল জীববিজ্ঞানীর মনে হল, তাহলে বাদুড়ও কি তাই করে?

শুরু হল নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চোখ বেঁধে দিলে কী হয় তা আগেই জানা ছিল ; এবার চোখ খুলে রেখে কানের ফুটো দুটি বন্ধ করে ঘরের বদ্ধ ঘটাকাশে তাকে ওড়ানো হল। বেচারা বাদুড়। সে-এদিকে-ওদিকে ক্রমাগত ধাক্কা খেল। অর্থাৎ প্রমাণিত হল, অত্যদ্ভুত উড্ডয়ন-সাফল্যের সঙ্গে বাদুড়ের শ্রবণযন্ত্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এরপর চোখ-কান খুলে রেখে শুধু মুখটা বেঁধে তাকে উড়তে দেওয়া হল। আশ্চর্য! এবারও সে ক্রমাগত ধাক্কা খেল! অর্থাৎ শ্রবণযন্ত্রের মতো তাহলে ওর বাগ্‌যন্ত্রও এ কাজের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন ; বাদুড় মুখ দিয়ে শব্দতরঙ্গ ছাড়ে এবং কান দিয়ে শোনে কতদূর থেকে প্রতিহত হয়ে সে শব্দ ফিরে আসছে। এ জন্যই সে ধাক্কা খায় না। অর্থাৎ মানুষের পূর্বেই বাদুড় ঐ রেডার যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে!

সওয়ালের এই পর্যায়ে ম্যাক্‌গ্রেগরি প্রতিবাদ করে ওঠে : অবজেকশন, য়োর অনার! ওঁর বাদুড়টা যদি মুখে শব্দ করে থাকে তাহলে, ঘরশুদ্ধ আমরা কেউই তা শুনতে পাইনি কেন?

আমি বললুম, হুজুর! বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তার একমাত্র হেতু বাদুড় যে শব্দতরঙ্গ ছাড়ে তা 'সুপারসনিক', অতি সূক্ষ্ম। অর্থাৎ সে শব্দ-তরঙ্গ ওরাই শুধু



শুনতে পায়, এই বাদুড়েতর মানুষের শ্রবণযন্ত্র অত উন্নতমানের নয়।

আমার ঐ 'বাদুড়েতর' বিশেষণটায় ম্যাক্‌গ্রেগরি কোনো প্রতিবাদ করল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে ঘাবড়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু আপনি যা বলছেন তা তো হতে পারে না!

—কেন পারে না?

—একটু আগেই আমরা টি ভি-তে দেখলাম যে রেডার যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে চুম্বক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গগ্রাহক যন্ত্রটা ইলেকট্রনিক সার্কিটে বন্ধ হয়ে যায় ; যাতে প্রাথমিক তরঙ্গটা ধারকযন্ত্রে ধরা পড়ে না, শুধু প্রতিহত তরঙ্গটাই ধরা পড়ে। বাদুড়ের মস্তিষ্কে তো ইলেক্‌ট্রনিক সার্কিট নেই। ফলে সে দু-জাতের শব্দতরঙ্গ শুনবে। এক নম্বর তার মুখনিঃসৃত প্রাথমিক শব্দ, দু নম্বর বস্তুতে প্রতিহত প্রতিধ্বনি। তাহলে তো সব তালগোল পাকিয়ে যাবে।

আমি বললুম, এ সমস্যার কথাও জীববিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। অতি সম্প্রতি সে সমস্যারও সমাধান হয়েছে। দেখা গেছে, বাদুড়ের কর্ণপটাহে একটি ক্ষুদ্র মাংসপেশী আছে যা এই কাজটা করে থাকে। মুখ দিয়ে শব্দতরঙ্গ ছেড়ে দেওয়া মাত্র প্রতিবর্তী-প্রেরণায় (reflex action-এ) ঐ মাংসপেশী সক্রিয় হয়ে ক্ষণিকের জন্য কর্ণকুহরের দ্বারটি বন্ধ করে দেয়। পরমুহূর্তেই সেই ভাল্‌ভটি সরে যায়, যাতে খণ্ডমুহূর্তের ব্যবধানে ঐ প্রতিধ্বনিটা সে শুনতে পায়।

সবাই নড়েচড়ে বসে। ম্যাক্‌গ্রেগরি একেবারে স্ট্যাচু। আমি বিচারকদের দিকে ফিরে একটি 'বাও' করে বলি, ধর্মাবতার। মানুষ রেডার আবিষ্কার করেছে বিংশ শতাব্দীতে! কিন্তু বাদুড় করেছে পাঁচ কোটি বছর আগে। ইয়োসিন যুগের পাথরের খাঁজে কিছু প্রাগৈতিহাসিক বাদুড়ের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, তারাও স্তন্যপায়ী এবং তারাও একইভাবে উড়ত। আমার সওয়াল শেষ হয়েছে ধর্মাবতার। এবার আপনি রায় দিন।

বিচারক বললেন, এ তো শুধু ফার্স্ট রাউন্ডের খেলা হল। তারপর?

—জাস্ট এ মিনিট!—দাঁড়িয়ে উঠেছে বার-ম্যান! যেন হাই কোর্টের উপর সুপ্রিম কোর্ট! গটগট্ করে সে এগিয়ে এসে আমার সামনে রাখল একটা ম্যাগনাম সাইজ হোয়াইট-হর্স হুইস্কি। বলল, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন স্যার! বিল আপনাকে মেটাতে হবে না!

*  *  *  *

সেকেন্ড রাউণ্ড! আর্দেন ড্যাম! এবার আমার সাক্ষী বীভার। কানাডা ও উত্তর আমেরিকায় ওদের বাস। এককালে প্রায় সারা পৃথিবীতে ছিল। ওর চামড়ার লোভে মারতে মারতে আমরা ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছি! বীভার থাকে 'বীভার লজে'। নিজেরাই সে-বাসা বানায়। অর্ধেক জলের নিচে, অর্ধেক উপরে। সে অর্থে ওরা উভচর। জলের নিচে বীভার লজ হাত-পাঁচেক চওড়া, উপর দিকটা সূচালো। পাথর ও গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে ওরা এই

*বীভার*

লজ বানায়। এক-এক লজে থাকেন একজন কর্তামশাই, দু-তিনটি রাণী তাঁর গুটিকতক ছানাপোনা নিয়ে। মজা হচ্ছে এই যে, ছানাপোনাদের মধ্যে যে-কটা মদ্দা তারা একটু লায়েক হলেই বাপ বলে, 'বাপুহে! এবার নিজের লজ নিজে বানাও।'

লায়েক ছেলে রাগ করে না। জানে, এটাই অলিখিত আইন।

এক একটা বীভার লজের চৌহদ্দি সীমাবদ্ধ। বীভার-সংখ্যা এবং ঐ চৌহদ্দিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যবস্তুর একটা গাণিতিক সম্পর্ক আছে। ভিড় বেশি হলে সবাইকেই না খেয়ে মরতে হবে। তাই এই প্রাকৃতিক আইন ওরা মেনে চলে।



লায়েক ছেলে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। কাছেপিঠেই যদি কোনো বদ্ধ জলা বা হ্রদ পায়, যেটা অন্য বীভার-লজের এক্তিয়ারভুক্ত জমি নয়, তাহলে সেখানেই একটা লজ বানায়। এমন তৈরি লজ পেলে কোন্-না মেয়ে বীভার আকৃষ্ট হবে? ফলে ঐ লায়েক ছেলে নতুন লজে নতুন করে সংসার পাতে।

কিন্তু যদি কাছে-পিঠে তেমন হ্রদ না থাকে?

তখনই ওকে আর্দেন-ড্যাম বানাতে হয়। প্রথমেই ভৌগোলিক অবস্থানটার একটা জরিপ করে নেয়। সম্‌ঝে নেয়, বর্ষার জলধারা কোন পথে নিকাশ হয়। তারপর প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ কেটে নামায়। বড় বড় ডালের ছোটখাটো পাতা বা ছোট ডাল ছেঁটে টুকরো বানায়, যাতে সেগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে অথবা নদীতে ভাসিয়ে এগিয়ে নেওয়া চলে। এভাবেই সে গাছের ডাল সাজিয়ে ঐ নিকাশি-নালার মুখটা বন্ধ করে দেয়। এরপর পাথর গড়িয়ে নিয়ে এসে ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে। এবং তারপর কাদামাটি এনে ঐ পাথরের মাঝের ফাঁকগুলো বন্ধ করে। নিরেট-নিশ্ছিদ্র দেওয়াল, যেন ছয়-এক সিমেন্ট-বালির গাঁথনি! শুধু কেন্দ্রীয় অবস্থানে কিছুটা অংশে 'মর্টার-জয়েন্ট' করা হয় না। সেখানে থাকে একটা খাড়া ফোকর বা ভার্টিকাল শাফ্‌ট। বায়ু চলাচলের জন্য। বাঁধটা ওরা বর্ষা আসার আগেই শেষ করে। বর্ষার ঢল নামলে দেখা যায়, সেখানে একটা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি হয়েছে। লজটা কিছুটা জলের নিচে, কিছুটা উপরে। এমনকি দুরন্ত শীতে যখন জলের উপরিভাগে জমে বরফ হয়ে যায় তখনও ঐ 'ভার্টিকাল শাফ্‌ট' দিয়ে বায়ু গমনাগমনের সুড়ঙ্গ থাকে। এই লজের ভিতর ওদের বেডরুম, ডাইনিং রুম, নার্সারি সবই আছে—মায় শীতকালের জন্য মজুত প্রকাণ্ড ভাঁড়ার।

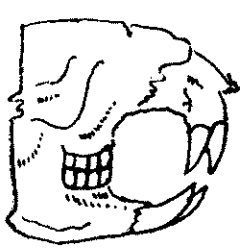

*বীভারের শিরঃকঙ্কাল*

লজ সংলগ্ন ড্যামগুলি কত বড় হয়? দু-এক মিটার থেকে শুরু করে অনেক বড় হতে পারে। আমেরিকার জেফারসন নদীতে একটি বাঁধ বোধহয় ওদের জগতের রেকর্ড। সেটা দৈর্ঘ্যে 650 মিটার!

—ধর্মাবতার! আমি প্রমাণ করতে পারি, বীভার এই 'আর্দেন-ড্যাম' এবং

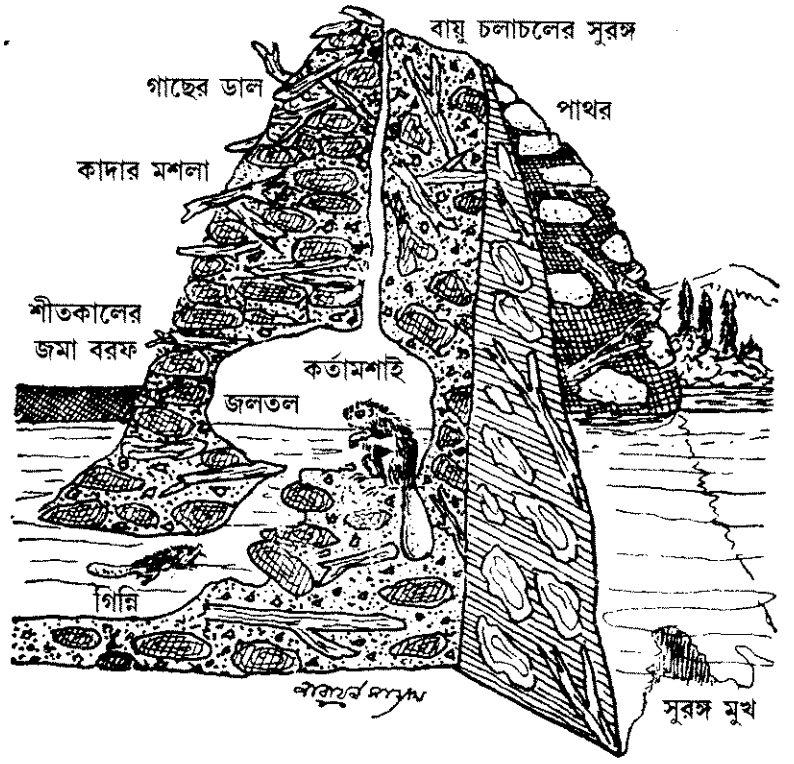


*'বীভার লজ'*

বীভার লজ বানাতে শুরু করেছে মানুষ মাটির বাঁধ তৈরি করায় হাতেখড়ি দেওয়ার আগেই। শুনুন....

জজসাহেব বাধা দিয়ে বললেন, প্রয়োজন হবে না। সেকেন্ড রাউন্ডেও আপনি জিতেছেন। এবার কোয়ার্টার ফাইন্যাল! ইলেক্‌ট্রিসিটি?

—আজ্ঞে হাঁ, ইলেক্‌ট্রিসিটি!

—অনেক জীব বিবর্তনের তাগিদে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছে, যখন মানুষ কাঁচা মাংস খেত, গায়ে জামা-কাপড় দিত না। যেমন ধরা যাক 'টর্পেডো মাছ'। দেখলে মনে হয়, একটা সস্‌প্যান বুঝি স্টিমরোলারের তলায় চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। এরা অল্প জলে বসবাস করে। বালির মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। মনে আছে, একবার গ্রীস উপকূলে এই জীবটির



প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়েছিলুম। সমুদ্রের ধারে একটা বালিয়াড়ির উপর বসে একজন গ্রীক মৎস্যজীবীর বিচিত্র শিকারপদ্ধতি লক্ষ্য করছিলুম। সে তেফলা একটা বর্শা নিয়ে হাঁটুজলে হেঁটে হেঁটে মাছ ধরছিল। এখানে জলে ঢেউ নেই, সমুদ্র হ্রদের মতো শান্ত। লোকটা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বড় মাছ গেঁথে তুলেছে এবং একটা অক্টোপাস! জেলেটা মাছ ধরতে ধরতে ক্রমশ আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল। যখন মাত্র ফুট ত্রিশেক দূরে তখন দেখি সে বর্শাটা মাথার উপর তুলে প্রস্তর মূর্তিতে রূপান্তরিত। নিশ্চিত সে জলের তলায় একটা বড় জাতের মাছ দেখেছে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই—'বাবাগো! মাগো! মেরে ফেললে গো!'—চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সে জলে শুয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই বর্শাটা ফেলে দিয়ে খবল্‌-খবল্‌ করতে করতে সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল ডাঙায়। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। তার সেই মরণান্তিক চিৎকার শুনে আধমাইল দূরের মানুষও ছুটে এসেছে। ওরা উত্তেজিত স্বরে কী যেন বলাবলি করছে। ভাষাটা বুঝিনি, সেটা গ্রীক। আক্ষরিক অর্থেও। তবে লক্ষ্য করে দেখি, সবাই অতি সাবধানে ইতি-উতি চাইতে চাইতে বালিতে পা ফেলছে। কী ব্যাপার? একজন ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে পারল। তার কাছ থেকে জানা গেল, এখানে টর্পেডো-মাছ আছে। বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে, সহজে নজর হয় না। শত্রুকে আক্রমণ করে ইলেকট্রিক ডিসচার্জে। অথচ আশ্চর্য! ওরা নিজেরা সে শক্‌ খায় না।

অবশ্য ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী হচ্ছে 'ইলেকট্রিক ঈল'। এরা কিন্তু আদৌ 'ঈল' নয়, অন্য প্রজাতির মাছ। যদিও দেখতে ঈল-এর মতো। লম্বা, কালো, প্রায় সাপের মতো দেখতে। সাকিন—দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো নদী। দৈর্ঘ্য আট ফুট পর্যন্ত হয়, গতরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের জানুর মাপ! এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প চালু আছে, অধিকাংশই অতিরঞ্জন, তবে ইলেকট্রিক ডিসচার্জে এরা একটা ঘোড়াকে পেড়ে ফেলতে পারে, মানুষকে তো বটেই।

একবার ব্রিটিশ গায়নাতে আমি একটি ইলেকট্রিক ঈল জোগাড় করেছিলুম। ধরিনি, কিনেছিলুম। জায়গাটা আমার হেডকোয়ার্টার্স থেকে মাইল পনেরো দূরে। একটা আদিবাসীদের গ্রাম। ওরা জীবজন্তু জ্যান্ত ধরায় ভারি দড়। আমাকে অনেকবার অনেক দুর্লভ জীব সরবরাহ করেছে। এবারও দিল একটা

পোষমানা সজারু, আর নানান জাতের পাখি। তারপর ওদের সর্দার বললে, 'বিজলি ঈল' আছে, নেবেন হুজুর? তবে দামটা—

—আমি বাধা দিয়ে বলি, দামের জন্য আটকাবে না, নিয়ে এস।

বস্তুত লন্ডন জু-তেও ইলেকট্রিক ঈল নেই। এই দুর্লভ জীবটির সাক্ষাৎ বহুবার পেয়েছি; কিন্তু ধরতে পারিনি। আসলে ছয় শত ভোল্ট বিদ্যুৎ-বজ্র দিয়ে যে জীব শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত, তাকে কেমন করে ধরব বুঝে উঠতে পারিনি।

লোকটা নিয়ে এল বেতে-বোনা খাঁচায় করে একটা মাঝারি সাইজ ঈল। মনে হল একেকবারে তিনি 440 ভোল্ট ছাড়তে পারবেন! দাম মিটিয়ে দেবার সময় তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন শুধু। সর্দার বলল, খুব সাবধানে একে নিয়ে যাবেন হুজুর।

কিছু পাখি, গাছ-সজারু আর ঈলটাকে নিয়ে আমরা রওনা দিলুম ক্যানোয় করে। যাত্রার মাঝামাঝি সময় ঐ বেতের খাঁচা থেকে কী করে জানি না ঈলটা বেরিয়ে পড়ে। আমাদের কারও নজরে পড়েনি ; সবার আগে সেটা নজরে পড়েছে ঐ গাছ-সজারুটার। তিন লাফে সেটা আমার মাথায় চড়ে বসেছে। ঠিক তখনই নজর হল ঈলটা তীরবেগে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি ত্রিং করে শূন্যে এক লাফ মারলাম। সজারুটা অতি ঘড়েল, আমি লাফ মরবার উপক্রম করতেই বেটা আমার চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে! ইতিমধ্যে ঈলটাও মারলে এক লাফ! মুহূর্তে নদীগর্ভে!

একমুঠো ডলার জলে গেল। তা যাক! সেই গ্রীক ছোকরার মতো আমাকে যে চিল-চেঁচানো চেঁচাতে হয়নি ইয়েল্লেগেই ঈল প্রভুকে লাখ লাখ সুক্রিয়া!

তার অনেকদিন বাদে একটি বিজলি ঈল এসেছিল আমার হেপাজতে। অনেক কসরৎ করে, শক্ না খেয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছিলুম লন্ডন জুতে। ওর খাদ্য ছিল জ্যান্ত মাছ। মনে আছে প্রতিদিন ঘড়ি ঘরে সে ঠিক খাওয়ার সময় বেশ চঞ্চল হয়ে উঠত। চক্রাকারে পাক খেত চৌবাচ্চায়। দৈর্ঘ্যে সে ফুট পাঁচেক। আট দশ ইঞ্চি লম্বা মাছ সে অনায়াসে গিলে ফেলত। তার আহার পদ্ধতিটা বিচিত্র। জলে জ্যান্ত মাছটাকে ছেড়ে দিলেই সে স্তব্ধ হয়ে যেত। মড়ার মতো ভাসতো। নড়াচড়ার লক্ষণই নেই। নিদারুণ ঔদাসীন্যে সে ঐ মাছটির জলকেলি উপভোগ করত। ঘুরতে ঘুরতে মাছটা যখন ওর হাতখানেক দূরত্বে



আসত, অমনি ঈলটার সর্বাঙ্গ একবার থরথর করে কেঁপে উঠত। যেন ওর দেহের ভিতর একটা শক্তিশালী ডায়নামো পূর্ণবেগে চালু হল। চক্ষের নিমেষে দেখতুম মাছটা নিথর হয়ে গেছে। বজ্রাহত মানুষ যেমন জানতে পারে না কীভাবে মৃত্যু এগিয়ে এল। ধীরে ধীরে উল্টে যেত মাছটা। ভেসে উঠত জলতলে। অতি মন্থর গতিতে তখন ঈলটা এগিয়ে আসত এবং মুখব্যাদান করত। পরমুহূর্তে যেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পাইপে কিছু ধুলোবালি ঢুকে গেল। মাছটার আর চিহ্নমাত্র নেই।

আমার দীর্ঘ সওয়ালে ম্যাক্‌গ্রেগরি একবারও বাধা দেয়নি। এখন সে নড়ে-চড়ে বসতেই আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, ইয়েস ক্যাপ্টেন! বুঝেছি আপনার বক্তব্য। প্রমাণ চাই। এই তো। সৌভাগ্যক্রমে প্রমাণ আছে ; এই জাহাজেই। আমি ইতস্তত করছিলাম শুধু এজন্য যে ওর খাঁচাটা বড় পল্‌কা—একটা দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। তা হোক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া....

সমগ্র জনতা একযোগে হাঁ হাঁ করে ওঠে। ম্যাক বলে, থাক! আপনাকে আর কেদ্দানি দেখাতে হবে না। এ জাহাজে ভালমন্দ কিছু ঘটে গেলে আমিই দায়ী হব! কিন্তু ডাইভিং বেল?

ঈল অবশ্য সেবার আমার হেপাজতে ছিল না আদৌ!

—ইয়েস! ডাইভিং বেল। সেমি-ফাইন্যাল আইটেম : ডাইভিং বেল!

ধর্মাবতার আমি প্রমাণ করব, মানুষের অনেক অনেক আগে না-মানুষেরা ডাইভিং বেল আবিষ্কার করেছে। 'ডাইভিং বেল' কী? এর সাহায্যে ডুবুরি জলের তলায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে। উপুড় করা পাত্রের মধ্যে অক্সিজেনকে আটক করে। মানুষ এটা আবিষ্কার করেছে কয়েকশো বছর পূর্বে, কিন্তু জল-মাক্‌ড়শা সেটা করেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। ওরা বুঝে নিয়েছিল জলে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সংসার করতে হলে জলের তলায় বাতাসকে বন্দী করতে হবে। এজন্য ওরা অদ্ভুত একটা কায়দায় অভ্যস্ত হল। পিছনের দুটি পায়ে এবং পেটের খাঁজে বাতাসের একটা বুদ্বুদকে আটক করে ওরা জলের কিছুটা নিচে যেতে পারে। বেশি নিচে নয়, কারণ যত নিচে যাবে, জলবুদ্বুদের ঊর্ধ্বচাপও তত বেশি হবে। তাই জলতলের ঠিক নিচেই ওদের বাসা। সেখানে পদ্মপাতার উল্টো দিকে আঁকড়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী খেয়ে ওরা বাঁচে। দম ফুরিয়ে গেলে ঐ পেটের খাঁজে আটকানো বুদ্বুদ থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে

নিমজ্জমান অবস্থাটা দীর্ঘায়ত করে।

এখানেই ওরা থামল না কিন্তু। বংশরক্ষার বিবর্তন-তাগিদে ওরা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। জলের নিচে ওদের বাসায় বাতাস সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করল। ওদের বাসার আকৃতি যেন একটা উবুড়-করা খাস-গেলাস। লতা গুল্মে

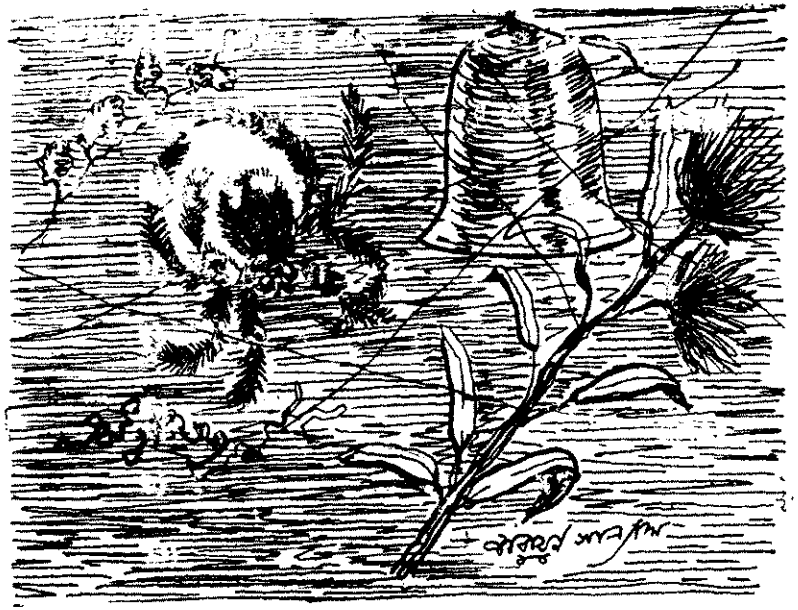

*"ওমা তাইতো! এ যে মস্ত বড় বুদ্বুদ! সোনা ছেলে!"*

এমনভাবে আটকানো, যাতে সেটা উল্টে যেতে না পারে। বাপ-মাকড়শা আর মা-মাকড়শা দুজনেই সেই ভালো-বাসায় ক্রমাগত সঞ্চয় করতে থাকে—না খাদ্য নয়, বাতাস। বারে বারে উপরিভাগে উঠে যায় পেট-কোঁচড়ে নিয়ে আসে ছোট্ট একটা বাতাসের বুদ্বুদ! ঐ বাসার ঠিক তলায় এসে বুদ্বুদটাকে ছেড়ে দেয়। সেটা আটক পড়ে খাস-গেলাসের মাথার কাছে, জলের সমতল এক চুল নেমে আসে। এইভাবে ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ হবু বর-বউ তাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটা পরখ করে ; ভাঁড়ারে কতটা বাতাস জমেছে। অজাত সন্তানদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট মনে হলে তবেই ওরা বাসরশয্যা পাতে। কুমার-কুমারী অবস্থায় এই সঞ্চয়টুকু না সেরে তারা দৈহিক মিলনে সম্মত হয় না। আশ্চর্য সংযম এ



বিষয়ে! হয়তো ঐ যৌথ কাজের আসরেই তাদের বাসরের বীজ বপন করা হয়। অবশেষে বাসার ভিতর মা-মাকড়শা ডিম পাড়ে ; তা থেকে বাচ্চা হয়। শিশু-মাকড়শার অক্সিজেনের অভাব হয় না। পিতামাতার সযত্নসঞ্চিত অক্সিজেনে তারা জীবনের প্রথম পর্যায়টা পাড়ি দেয়—ঠিক যেমন মানুষের বাচ্চা মায়ের বুকের দুধে, বাপের সংগ্রহ করা ল্যাক্টোজেনে ওঁয়া-ওঁয়া থেকে হাঁটি-হাঁটিতে উন্নীত হয়। একটু লায়েক হলেই বাবা-মা দুজনেই একসাথে ধমক লাগায় : বুড়োধাড়ি ছেলে! নিজের বুদ্বুদ নিজে রোজগার করতে পার না?

তাড়া খেয়ে খোকন বাসা ছাড়ে। পড়ি তো মরি করে ভেসে ওঠে জলের ওপর। তারপর—কে তাকে শেখায় জানি না, ঠ্যাঙ দুটো বাঁকিয়ে, পেট-কোঁচড়ে টপ করে পাকড়াও করে ফেলে একটা বায়ুবুদ্বুদ! টুপ করে ডুব দেয় আবার জলে। বুদ্বুদটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে আস্তে খাস-গেলাসের তলায়। হাঁক পাড়ে, মা, মা, দেখ কী এনেছি।

মা বলে, ওমা তাই তো! এ যে মস্ত বড় বুদ্বুদ! সোনা ছেলে!

এবার ফাইনাল রাউন্ডের খেলা : ফ্রিজিডেয়ার।

ফ্রিজিডেয়ার কী? এমন একটা যন্ত্র, যাতে খাদ্য দ্রব্য দীর্ঘসময় সঞ্চয় করে রাখা যায়, পচনকার্য শুরু হতে পারে না। আমরা মাছ, মাংস, রান্না তরকারি ফ্রিজে রেখে দিই ; সময় ও সুযোগমত তারিয়ে তারিয়ে খেতে। অসুবিধা শুধু একটাই, ঠাণ্ডা খাবারটা আবার গরম করে নিতে হয়। না-মানুষেরা আমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। তারা 'ফ্রিজ' করে, কিন্তু খাবারের উত্তাপ সমানই থাকে! অথচ পচনকার্য শুরু হয় না।

এ বিষয়ে আমার সাক্ষী—শিকারী বোলতা বা hunting wasp। বংশরক্ষার তাগিদে মা-বোলতা মাটি দিয়ে একটা বাসা বানায়। তাতে অনেকগুলি ছোট-ছোট সুড়ঙ্গ। এক-একটির ব্যাস সিগ্রেটের মতো, দৈর্ঘ্য আধখানা সিগ্রেট। তার ভিতরে বোলতা ডিম পাড়ে। কিন্তু বাসার মুখটা বন্ধ করে দেবার আগে তাকে আর একটা কাজ করতে হয়। কারণ ডিম ফুটে সরাসরি বাচ্চা হয় না, মাঝামাঝি একটা গুটিপোকার দ্বিতীয় অবস্থার মতো জীব ঐ গর্তে চার-পাঁচ সপ্তাহ বাস করে। ডিম অবস্থার ভ্রূণের খাদ্য বাহির

থেকে যোগান দিতে হয় না। আমরা জানি, মুরগির ডিমে লাল-অংশটা হচ্ছে অজাত শিশু এবং সাদা অংশটা তার খাদ্য। বোলতার ডিমেও দুটি অংশ, একটা

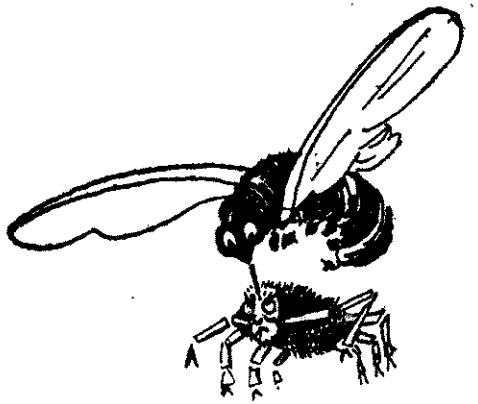

*শিকারী বোলতা কর্তৃক অ্যানস্থেশিয়া প্রয়োগ*

শিশুর দেহ-প্রাণ, অপরটা তার খাদ্য। কিন্তু ঐ 'লারভা' বা শূককীট অবস্থায় শিশু খাদ্য পাবে কোথায়? মা সেটা যোগান দেয়। বাসার মুখটা সীল করে দেবার আগে ঐ গর্তে সে মরা মাছি বা মাকড়শা অজাত শিশুদের খাদ্য হিসেবে রেখে দেয়।

কিন্তু তিন-চার সপ্তাহ কোনো মৃত জীবকে ঐ গর্তে রেখে দিলে সেটা নিশ্চিত পচে যাবে। তার অজাত শিশুদল খিদের জ্বালায় সেই পচা মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে বা মারা যাবে।

সুতরাং?

জীববিবর্তনের তাগিদে শিকারি বোলতা একটা নতুন আবিষ্কার করল কয়েক লক্ষ বছর আগে, যা মানুষ করেছে অতি সম্প্রতি : অ্যানাস্থেশিয়া।

শিকারি বোলতা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে যখন কোনো মাছি বা মাকড়শার উপর পড়ে তখনই তাকে হত্যা করে না। একটি হুল ফুটিয়ে ইন্‌জেক্‌শন দেয়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। তাতে জীবটা মারা যায় না, শুধু অসাড় হয়ে যায়। মা-বোলতা তখন সেই অচৈতন্য হতভাগ্যকে টানতে টানতে ঐ বাসায় নিয়ে যায়। এভাবে সাত-আটটি অচৈতন্য মাছি বা মাকড়শাকে একের-পর-এক সাজিয়ে রেখে বাসার মুখটা সীল করে দেয়। আশ্চর্যের কথা, দেখা



গেছে ঐ অচৈতন্য প্রাণীর সংখ্যা ও ডিমের পরিমাণ একটি অঙ্কের হিসাবে ছকা—অর্থাৎ অজাত শিশুরা 'শূককীট' অবস্থায় যেন খাদ্যাভাবে মারা না পড়ে, আবার অতিভোজনেও যেন পীড়িত না হয়।

জীববিজ্ঞানীরা ঐ বাসা ভেঙে অচৈতন্য প্রাণীগুলিকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। দেখেছেন সেগুলি মৃত নয়, অথচ জীবনের কোনো বাহ্য চিহ্নও নেই! ইনজেক্‌শন এমন অদ্ভুত যে, তাতে ঐ অচৈতন্য প্রাণীগুলি নিজেরাও খাদ্যাভাবে মরে যায় না। পুরো সাত-আট সপ্তাহ অর্ধমৃত অবস্থায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। তারা ঘুমের মধ্যে জানতেও পারে না কখন বোলতা-শিশু ডিম ছেড়ে শূককীট হল, কখন তারা গুটি গুটি এগিয়ে এল এবং ধীরে-সুস্থে ঐ সারবাঁধা টাটকা জ্যান্ত খাবারগুলি খেতে শুরু করল। মৃত্যু কীভাবে ঘনিয়ে এল তা তারা জানতেও পারল না।

আমার শ্রোতৃবৃন্দ নির্বাক।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ম্যাক্ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কোনো সাড় নেই। যেন কোনো শিকারি বোলতা তাকে হুল ফুটিয়ে রেখে গেছে! এক জাহাজ মদ্য-লোভীর আক্রমণে তার মৃত্যু কীভাবে ঘনিয়ে আসবে তা যেন সে জানতেও পারবে না।

গল্পটা আমার ঐখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু সামান্য একটু উপসংহার বাকি আছে :

প্রায় বছরখানেক পরের কথা। আমস্টার্ডামে একটি পার্টিতে একজন ফরাসি মহিলার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে উনি বললেন, অতি সম্প্রতি 'সী কুইন' জাহাজে চেপে তিনি আমস্টার্ডামে এসেছেন। শুনে আমি বললুম, ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন আইরিশম্যান.....

ভদ্রমহিলা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, মস্যুয়ে ম্যাক্‌গ্রেগরি তো? চমৎকার মানুষ। দারুণ গল্পুড়ে। ঠিক আপনার মতো জীবজন্তু নিয়ে মেতে আছেন। অনেকগুলো পোষা জন্তু আছে তাঁর।

আমি তো থ।

উনি বলেই চলেন, একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের সবাইকে শুনিয়েছিলেন

জন্তুজানোয়ারেরা কী বুদ্ধিমান! শুনলে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

সৌজন্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হল, তাই নাকি? ভেরি ইন্টারেস্টিং।

—দারুণ! দারুণ! আপনি তো শুধু চিড়িয়াখানার জন্য জন্তুজানোয়ার ধরে আনেন। কিন্তু কোনদিন কি ভেবে দেখেছেন, ওদের মধ্যে হয়তো কত পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, দার্শনিক আছেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, ম্যাক্ তাই বললে? কী বলেছিল সে?

—সব কথা আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। উনি বলেছিলেন :

'হিঙ্গোপম' নামে একজন বাদুড় নাকি জীবজগতের প্রথম 'রেফ্রিজেটার' বানান, একজন শিকারী-বোলতা রেডারযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—আরও কী কী সব! মোট কথা ম্যাক্‌গ্রেগরি একজন উঁচুদরের না-মানুষ-দরদী।

না-মানুষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ; মনুষ্যেতর, জানোয়ার, অমানুষ ইত্যাদি শব্দ মস্যুয়ে ম্যাক্‌গ্রেগরি একদম বরদাস্ত করেন না। বলেন, এতে ওঁদের অপমান করা হয়। ঐ-সব না-মানুষ গ্যালিলেও-নিউটন-আইনস্টাইনদের!



# পদ্মপত্রবিহারিণী

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরদিকে ব্রিটিশ গায়েনাকে আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ। তার কিছুটা বিষুব-অঞ্চলের ঠাস-বুনোট জঙ্গল, কিছুটা দিক-হারানো সাভানার তৃণভূমি। কিছুটা পাহাড়-পর্বত ; তার মাঝে মাঝে ঝরনা আর জলপ্রপাত। জানি, প্রতিবাদ উঠবে, এসব কি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই? তা মানছি, আসলে ওখানে হরেক রকমের জীবজন্তু-পশুপাখির সন্ধান পেয়েছিলুম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চেয়ে ওরাই আমাকে বেশি করে টানে—ঐ জীবজন্তু, পাখি, গুবরে-পোকা, প্রজাপতি, গঙ্গাফড়িং।

সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সমুদ্রের কাছাকাছি একমুঠো লবণাক্ত জলাভূমি। জর্জটাউন থেকে ভেনিজুয়েলার সীমান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার পাহাড়ি ঝরনা এক ঝাঁক স্কুল-ছুটি বেণীদোলানো মেয়ের মতো নাচতে নাচতে ছুটেছে বাড়ি পানে। তারপর হঠাৎ সমুদ্রের গর্জন শুনে ওরা যেন থমকে গেছে। কিশোরী নদী হয়েছে পূর্ণযৌবনা হ্রদ। আকাশের অগুন্‌তি তারা এতদিনে ওদের আঁচলে চুমকি বসানোর সুযোগ পেয়েছে। ঐ বদ্ধ জলাভূমির দু পাশে ঘন বন, আর তার খাঁজে খাঁজে হাজার জীবজন্তুর ডেরা।

১৯৫০ সালে যেতে হয়েছিল সেই অবাক অরণ্যে। কারণ লণ্ডন চিড়িয়াখানার ডিরেকটার আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমন্ত্রণলিপির একটা লম্বা তালিকা। রীতিমত মোগলাই নিমন্ত্রণ—ধরে আনা শুধু নয়, বেঁধে আনা। তখন আমার জীবিকা—চিড়িয়াখানায় জ্যান্ত জীব-জন্তু সরবরাহ করা।

যখন পৌঁছলুম তখন বর্ষা সবে শেষ হয়েছে—জলাটা আকণ্ঠ টলমল। জন্তু ধরার সিজন শুরু হতে তখনও মাসখানেক বাকি। অগত্যা সাময়িকভাবে আস্তানা গাড়তে হল ঐ জলাভূমির কিনারে। গ্রামটার নাম 'সান্তা রোজা'। সেখানে পৌঁছতেই লাগল পুরো দুদিন। প্রথম দিন অনেকটা পাড়ি দেওয়া গেল মোটর লঞ্চে, এমিকুইবো নদীর উজানে। দ্বিতীয় দিন ছোট্ট ডিঙিতে, কারণ

নদী ক্রমশ এত সরু হয়ে গেল যে, দুপাশের গাছ-গাছালি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের দেখতে। আকাশটাকে মুছে দিয়ে। বারে বারে মাথা ঝুঁকিয়ে, 'শির সাম্‌হালকে' ডিঙি বেয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল, গাছ-গাছালির ঠোক্কর থেকে মাথা বাঁচাতে। বুঝলুম, হাজার কুর্নিশ আদায় না করে এ কুমারী-ভূখণ্ড আগন্তুককে 'ভিসা' দেয় না। জল আদৌ দেখা যাচ্ছে না—সবটাই পদ্মপাতা, কচুরিপানা, আর নাম-না-জানা উদ্ভিদের কার্পেট পাতা। কখনও বা মনে হচ্ছে অরণ্যদেবী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তোরণ বানিয়ে রেখেছেন, দু পাশের গাছের ঝুঁকে পড়া ডালের তোরণ। মনে হচ্ছে নদীপথে নয়, আমরা যেন একটা টানেল ভেদ করে চলেছি।

দু-একবার নজরে পড়ল গাছের ডালে বসে আছে কাঠ-ঠোকরা। ঠোঁট-বাটালির ঠকাঠক্ হঠাৎ থেমে যাচ্ছে আমাদের দেখামাত্র। ঘন কালো রঙ, বেশ লম্বা। সাদা ঠোঁট আর আবীর-রঙা বুক। ডিঙিটা এগিয়ে আসতে দেখলেই চট করে সরে যাচ্ছে গাছের ওপিঠে, সেখান থেকে পুটপুট করে তাকিয়ে দেখছে: কে এল রে এ পাড়ায় জ্বালাতে?

হরেক রঙের প্রজাপতি ইতিউতি ওড়াউড়ি করছে ; নির্ভয়ে কখনও বা এসে বসছে গলুয়ের মাথায়, অথবা আমার কাঁধে! আবার হঠাৎ হঠাৎ কোথাও কিছু নেই 'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর' শব্দ করে লাফ দিয়ে উঠছে মাছরাঙা। পাখিটা যে ওখানেই ছিল আগে নজর হয়নি, এমনই মিলেমিশে ছিল ডালপাতার সঙ্গে। মাছরাঙাটা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে দারোগার ভূমিকায় অভিনয় করছে। তেমনি তার দ্রুতচ্ছন্দ প্রবেশ : ঐ চোর, ঐ চোর, ঐ চোর।

লাল-নীল-সবুজ-হলুদের একটা উড়ন্ত রামধনু যেন। পরমুহূর্তেই একটু দূরে ঝুপ করে ডানামুড়ে বসে পড়েছে। হারিয়ে যাচ্ছে ডালপালার কামোফ্লেজে। এখন আর 'দারোগা' নয়, ধ্যানীবুদ্ধ। কে বলবে, এক মিনিট আগে ও 'কে-চোর, কে-চোর?' চিৎকারে পাড়াটা সচকিত করে তুলেছিল!

আচ্ছা, ও কেমন করে বুঝল বলত—যে আমি সত্যিই চোর—এসেছি ওদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যেতে?

শেষমেশ যে গ্রামে গিয়ে আস্তানা গাড়লুম তাকে গ্রাম না বলে দ্বীপই বলা উচিত। দশ-বিশ-ঘর আদিবাসীর একটি বসতি ; চারদিকেই বর্ষার বদ্ধজলা। ওরা আমাকে যে কুঁড়েঘরখানায় থাকতে দিল তা গাঁয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে।



হ্রদের ঠিক কিনারে। গোলপাতায়-ছাওয়া একখানা ঘর আর ঐ জলাটার দিকে একচিলতে একটা বারান্দা। জলাটার গভীরতা হাত দুত্তিন হয়-কি-না হয়, শীতকালে জল সরে গেলে সেখানে জেগে উঠবে পলিমাটির আস্তরণে উর্বর জমি। আদিবাসীরা তাতে নানান শীতালী ফসল ফলাবে।

এখানে জলবন্দী হয়ে হপ্তা-তিনেক অপেক্ষা করতে হবে। কাজের মধ্যে কাজ কিছু পেপারব্যাক বই পড়া। অবশ্য স্টোভে নিজেকেই রান্না করতে হত। বাকি সময় চুপচাপ বসে থাকতুম ঐ বারান্দাটায়, ইজিচেয়ার পেতে।—সঙ্গে একটা বেশ জোরাল বাইনোকুলার ছিল ;— খুবই জোরাল—বিশ মিটার দূরে গাছের ডালে বসা ম্যাগ্‌পাইটা ঘুমাচ্ছে না চোখ পিটপিট করেছে তাও বলে দেওয়া যায়। তাই ঘরে বসেই বুঝতে পারি, কী অদ্ভুত এক চিড়িয়াখানায় এসে পড়েছি! কত বিচিত্র রকমের প্রাণী, কত বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা।

যেমন ধরা যাক 'গোগো'-কে। না 'গোগো' কোনও জন্তুর নাম নয়, আমি ঐ নাম দিয়েছিলুম। সেটা আসলে 'রাকুন'। মাপে একটা ছোটজাতের কুকুরের মত। লেজে সাদা-কালো ডোরাকাটা চক্র। চ্যাপ্টা একজোড়া নখওয়ালা সামনের থাবা, শরীরটা ধূসর রঙের। সবেচেয় বাহারে ওর চোখজোড়া—মনে হয় সবসময় একটা কালো 'গোগো গগলস্' পরে আছে। গগলস্-এর ঠিক মাঝখানে আবার এক-জোড়া ফুটো। তার ভেতর দিয়ে দেখা যায় ওর সন্ধানী দুটো চোখ। ওর নড়ন-চড়ন ভাবভঙ্গি দেখে মনে পড়ে যায় যোগেশবাবুর মুকাভিনয়। রাকুনটা রোজ সন্ধের ঝোঁকে জলার ধারে হাজির হয়। শিকার ধরতে। আমি নিঃসাড়ে ওকে লক্ষ্য করি।

জলের ঠিক কিনারায় এসে ও জাঁকিয়ে বসে। ঘাড়টি কাত করে জলের ভেতর তার প্রতিবিম্বটাকে লক্ষ্য করে। যেন দেখছে—গোগো চশমাটা নাকে চড়িয়ে তার সান্ধ্য প্রসাধনটা কতটা খানদানি হয়েছে। তারপর আশেপাশে ভালোভাবে একনজর দেখে নিয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে বেশ কিছুটা জল পান করত। আবার জল থেকে উঠে দু-পায়ে ভর দিয়ে বসে জল-আয়নায় দেখে দেখে পরিপাটি করে গোঁফজোড়া মুছে নিত। ব্যস, এরপর ডিউটিতে নেমে পড়ত সে।

ধীরে ধীরে এক কোমর জলে এগিয়ে এসে 'থাপন-জুড়ে' বসে পড়ত।

এবার ডান হাতটা জলে ডুবিয়ে কী যেন একটা আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকে। তোমরা দেখলে ভাবতে : গতকাল বুঝি স্নানের সময় ওর একপাটি কানের দুল খোয়া গেছে, বেচারি তাই খুঁজছে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই ত্রিং করে এক

*রাকুন*

লাফ! কী ব্যাপার? ওর দু-থাবায় ততক্ষণে বন্দী হয়েছে জলচর কোন দুর্ভাগা—হয় ব্যাঙ, নয় কাঁকড়া। ব্যাঙ হলে মুহূর্ত মধ্যে কম্মো সারা! একটা ঝাঁকুনির ওয়াস্তা। আর কাঁকড়া হলে ওদের মরণপণ লড়াইটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। ডাঙায় উঠে যেইমাত্র সেটাকে আছড়ে ফেলে অমনি দু-দাঁড়া উচিয়ে কাঁকড়াটা খাড়া হয়ে ওঠে। মরণপণ লড়তে। কিন্তু রাকুনটা অতি খলিফা! কাঁকড়া-চরিত্র সম্বন্ধে সে রীতিমত ওয়াকিবহাল! বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে রাকুনটা প্রতি মিনিটে বার-চারেক একটা থাবা বাড়িয়ে দেয়। কাঁকড়া প্রতিবারেই তার দাঁড়া উঁচিয়ে কামড়াতে যায়, পারে না। কারণ রাকুনটা থাবা বাড়ায় বিঘৎ-খানেক দূরত্ব বজায় রেখে। মিনিট পাঁচ-সাত এই একই অভিনয়ের রিপিট শো। বারে বারেই রাকুনটা যেন বলতে থাকে : 'ও কুমির,



তোর জল্‌কে নেমেছি।'

কাঁকড়া তো ছার, আমিই বিরক্ত বোধ করি। একঘেয়ে 'লাল গানে নীল সুর' কতক্ষণ হাসি-হাসি মুখে শোনা যায় বল? পাঁচ-সাত মিনিট এই একই দৃশ্যের পুনরাভিনয়ের পর কাঁকড়াটার মতিচ্ছন্ন ঘটে। হয় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অথবা ভাবে—মড়ার মত নিঃসাড়ে পড়ে থাকলে হয়ত রাকুনটা কাছে ঘনিয়ে আসবে; তখনই রাকুনটা দেবে এক মরণ কামড়। কিন্তু রাকুনটা সে দিক দিয়েও যায় না। 'স্ট্যাচু' মেরে যায়। বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড। তারপর ঝপাৎ! এবার আর সে থাবা বাড়ায় না। ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁকড়াটার ওপর। তার তীক্ষ্ণ দাঁতের করাতকলে মুহূর্তমধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় হতভাগ্য কাঁকড়ার দেহটা।

এরপর—না, যা ভাবছ তা নয়! আহারপর্ব মোটেই শুরু হয় না। ব্যাঙ হোক অথবা কাঁকড়াই হোক, শিকারটাকে সে বেশ কয়েকবার জলে ধুয়ে নেয়। এই ধৌতপ্রক্রিয়া রাকুনের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তোমরা যেমন পেয়ারা, কুল বা কালোজাম না ধুয়েই মুখে পুরে দাও আর মায়ের কাছে ধমক খাও—রাকুন তা করে না। প্রতিটি খাদ্য-দ্রব্য—তা সে ব্যাঙ হোক, মাছ হোক, অথবা কাঁকড়াই হোক, ভাল করে না ধুয়ে কখনও মুখে দেয় না। কলকাতার চিড়িয়াখানায় এখন রাকুন নেই। যদি কখনও আসে তবে তাকে একটা 'সুগার-কিউব' উপহার দিয়ে মজা দেখ। রাকুনেন্দ্রনাথ সেটাকে তার জলের গামলায় ধুতে শুরু করবে। ধোবে, ধোবে আর ধোবে। শেষমেশ জল থেকে খালি হাতটা তুলে যখন সে ভ্যাবাচাকা, তখন তোমার ক্যামেরায় একটা ক্লিক করে দিও! অ্যালবামে সাঁটবার সময় তার ক্যাপসান হবে : যাচ্চলে!

দ্বিতীয় যে জীবটি আমার অবসর বিনোদনে অংশ নিতে আসত তার নাম 'গেছো সজারু'। আমার কুঁড়েঘরের পুব-দিকে ছিল একটা আম আর একটা পেয়ারা গাছ। এখানে সদলে তেনাদের আবির্ভাব ঘটত। সারা গায়ে ধূসর-সাদা কাঁটা, চোখ দুটি কুঁচফলের মত, কিন্তু দেখলে মনে হয় তাতে না-ঝরা জল বুঝি টলটল করছে। গাছের মগডালে তাঁরা তরতরিয়ে উঠে যেতেন সদলে সবার আগে। লেজটি মোক্ষম করে জড়িয়ে নিতেন একটা ডালে। তারপর পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে উবু হয়ে পংক্তিভোজনে বসে যেতেন। আম অথবা পেয়ারা। ওঁরা কখনও একা আসেন না—এগারোজন ফুটবলার গ্রে-রঙের জার্সি পরে যেন নাচতে নাচতে মাঠে নামছেন। তফাত এই—ফুটবল টিম

কখনও জিতে ফেরে, কখনও হারে ; ওঁরা কখনও হারেন না। গাছটিকে সাফা করে দিয়ে সদলে হিপ-হিপ-হুররে করতে করতে উধাও হন।

গাছ সজারুর অহিংস মুষ্টি-যুদ্ধ

শিরঃকঙ্কাল

ওদের একটা আচরণ আমার কাছে ভারি বিচিত্র লাগত। আহারপর্বের মাঝে—হাফটাইমে—ওরা জোড়ায় জোড়ায় অদ্ভুত কায়দায় বক্সিং লড়ত! প্রতিপক্ষ নিজ নিজ লেজ দিয়ে ডালটাকে শক্ত করে ধরে মোক্ষম লড়াই করত সামনের দুই থাবা দিয়ে। সে কী মর্মান্তিক লড়াই! ডাইনে-বাঁয়ে ঝুল দিয়ে ক্রমাগত ঘুষি চালাচ্ছে : স্ট্রেট কাট, আন্ডার-কাট, লেফট হুক—বক্সিং জগতের প্রতিটি কেতাবী মার! বাইনোকুলার দিয়ে দেখতুম ফেদার-ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের সে লড়াইয়ে ওদের মুখ চোখেও ফুটে উঠেছে প্রত্যাশিত অভিব্যক্তি: ক্রোধ, প্রতিহিংসা, সতর্কতা, জয়োন্মাদনা। মানুষী বক্সিং-এর সঙ্গে শুধু একটিমাত্র প্রভেদ : কোনও যোদ্ধা প্রতিপক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করত না। কারণ ওদের মধ্যে হাতখানেক ফাঁক। যাকে বলে বক্সিং-এর অহিংস সংস্করণ! এই অদ্ভুত আচরণের কী উদ্দেশ্য তা জীববিজ্ঞানীরা হয়ত বলতে পারবেন। আমি নিছক আনন্দ পেতুম।

তিন নম্বর যে জীবটির মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটত তার নাম 'douroucouli'. তিন জোড়া 'OU যুক্ত এই জীবটি হচ্ছে একজাতের বাঁদর। আফ্রিকান



'লেমুর' শ্রেণীর বানরের সঙ্গে নাকি জীববিজ্ঞান মতে এদের আত্মীয়তা আছে। সারা দুনিয়ায় একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় এঁরা এখনও টিকে আছেন। লেজ ছাড়া দৈর্ঘ্য গড়ে 330 মিলিমিটার এবং লেজের দৈর্ঘ্য 500 মি. মি.। অর্থাৎ উপকথার সেই 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।' এ পাড়ায় বোধ হয় এখন গোগোচশমার ফ্যাশন চলছে। কারণ এদের চোখগুলোও গোগো-চশমার মতো। গোটা বানর প্রজাতির মধ্যে তিন-তিনটে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। এক : এরাই একমাত্র নিশাচর-বানর। দুই : স্বজাতীয়ের মধ্যে—শুধু তাই বা কেন, সমান ওজনের যাবতীয় জীবের মধ্যে, এদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ, উচ্চগ্রামের। তিন : বানর শ্রেণীর জীবের মধ্যে এরাই শুধু মুখে মুখে চুমু খেতে জানে। দৌরৌকৌলিরা—বাঙলা বানানে সেটাই যদি তাদের নাম হয়—প্রতিদিন আসত না। তাদের আবির্ভাব কালেভদ্রে। ঘনঘন আগমন ঘটালে আমাকে বিপদে পড়তে হত ; কারণ অত বোরিক তুলো ছিল না আমার মেডিক্যাল ব্যাগে। তেনারা এলেই আমাকে কানে তুলো দিতে হতে কিনা!

*দৌরৌকৌলি*

রঙ্গমঞ্চে এবার চার নম্বর যে জীবটিকে উপস্থিত করছি, তিনি হচ্ছেন

আমার কাহিনীর খল-নায়ক : মিস্টার কেম্যান (Cayman)। দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতের মেছো-কুমির। আমাদের গাঙ্গেয় উপত্যকায় যাকে 'ঘড়িয়াল' বলে তারই অতি দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিভাই। লম্বায় আন্দাজ দেড় মিটার ; সাদা-কালো পিঠে ডুমো-ডুমো চক্রের বাহার। বেনারসী শাড়ির আঁচলে যেমন চিত্তির-বিচিত্তির করা থাকে, ওর লেজেও তেমনি নানান ড্রাগনী ঢঙের বাহার। চোখ দুটি ঢুলুঢুলু—বেড়ালের চোখের মত একটা দাগ ; কিন্তু উত্তেজিত হলে তা থেকেই আগুন ছোটে! সারাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকে—নট নড়নচড়ন—যেন সাঁজের ঝোঁকে একপাঁইট মদ গিলে পড়ে আছে খোঁয়াড়ি ভাঙার অপেক্ষায়। আমার কুঁড়েঘরের সামনে ঐ বদ্ধ জলাটায় বাস করত একটা কেম্যান। নিতান্ত একলা। বিবাগী, বৈরাগী কি না জানি না, কিন্তু কোনোদিন কোন স্বজনকে তার তত্ত্বতালাশ নিতে আসতে দেখিনি। কোনও অপরাধে ও বোধহয় একঘরে হয়ে আছে। কারণ এখান থেকে এক কিলোমিটার উজিয়ে গেলে আর একটা হ্রদে বিশ-পঁচিশটা কেম্যানকে সার বেঁধে রোদ পোহাতে দেখেছি।

আমার এ কাহিনীর নায়ক আছেন নেপথ্যে ; নায়িকা : মিস্ জাসানা (Jacana)। দক্ষিণ আমেরিকার এক বিচিত্র জলচর পাখি। কলকাতার চিড়িয়াখানায় জাসানা নেই—কিন্তু মুরহেন (Moorhen) আছে। এ ভদ্রমহিলাকেও দেখতে প্রায় একই রকম। তবে জাসানার দেহ আরও হালকা আর তার আঙুলগুলো মুরহেনের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা। জাসানা যখন পদ্মপাতার ওপর দিয়ে হেঁটেচলে বেড়ায়, তখন তার দেহের ওজন বিস্তৃততর বর্গক্ষেত্র চারিয়ে যায় বলে পদ্মপাতাটা ওর দেহভারে ডুবে যায় না। এজন্য ওদের আর এক নাম লিলিট্রটার। তাই একবার ভেবেছিলাম ওর নামকরণ করি : 'পদ্মপত্রবিহারিণী' ; কিন্তু পাছে কেউ নামটা খাটো করে 'পদ্ম' বা 'পদিপিসি' বলে ডাকতে শুরু করে তাই আমি ওকে 'মিস্ জাসানা' বলেই উল্লেখ করব।

কদিনের মধ্যে মালুম হল ঐ কেম্যান আর মিস্ জাসানার সম্পর্কটা অহি-নকুলের। না, ভুল হল। সাপ আর বেজি কেউ কারও কাছে হার মানে না। এদের সম্পর্কটা বরং পুষি আর মিনি মাউসের। তা মতপার্থক্য তো হতেই পারে। কেম্যানের বিশ্বাস প্রকৃতিদেবী জাসানকে এই জলাভূমিতে আশ্রয় দিয়েছেন একটিমাত্র শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে—তার একবেলার নাস্তা সারতে।



একঘেয়ে মাছ আর ব্যাঙ কতদিন খাওয়া যায়? একবেলা একটু নরম তুলতুলে পাখির মাংস—ওঃ! তোফা!

অথচ জাসানা যখন পদ্মপাতায় সতর্ক পা ফেলে চলাফেরা করে আর কেম্যানের দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে তারায় তখন স্পষ্ট অনুভব করি, সে মনে মনে গজগজ করছে : ঐ ঘাটের মড়া এখানে মরতে এসেছে কেন? ও যাক না কেন ঐ দূরের জলাটায়, যেখানে ওর জাতভায়েরা একটা এঁদোবস্তি বানিয়েছে। মর, মর মুখপোড়া।

কেম্যান বয়সে তরুণ। তার অভিজ্ঞতা অল্প। তাই তার শিকারপদ্ধতিটা রোজই হয়ে যায় কাঁচা-কাজ! কোনদিনই সে জাসানার নাগাল পায় না। রোজ সকালে দেখতুম জাসানা-সুন্দরী রীতিমতো 'সজ্জা' দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে এসেছেন। সাজের সে কী বাহার! পিঠে চকোলেট রঙের লেডিজ কোট, চোখে কাজল, ভ্রুর কাছে নীলচে রঙের ম্যাস্কারা—গলায় দুধ-সাদা একটা কম্ফটার, পায়ের মোজাজোড়া আকাশী নীল! পদ্মপাতায় চরণপাত করছেন ব্যালে নাচের ভঙ্গিমায় ; আর ইতিউতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করছেন। মাঝে মাঝে অতি দীর্ঘ আঙুল দিয়ে কোন একটি পদ্মপাতার কিনারাটি উল্টে ধরছেন। তার তলদেশে অবধারিতভাবে অসংখ্য সূক্ষ্ম জলজ জীব—পোকা-মাকড়, জোঁক, জল-মাকড়শা—সেই যাদের তুর্কিনাচন দেখেছিলুম 'পথের পাঁচালী' ছবিতে, বর্ষা-আগমন দৃশ্যে। জাসানা নিপুণ-ঠোঁটে তাদের খুঁটে খুঁটে খেত আর একটা চোখ মেলে রাখত তার জন্মশত্রু ঐ ঘাটের মড়ার দিকে। কিন্তু কোন কোনদিন জাসানা সুন্দরী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। ঠিক তখনই সক্রিয় হয়ে উঠত কেম্যান। অ—তি ধীরগতিতে, ঠিক যে-ভঙ্গিতে টিকটিকি এগিয়ে আসে শ্যামাপোকার দিকে, সেই ভাবে তিল তিল করে দূরত্বটা কমে আসে একটু একটু করে। সেন্টিমিটার— ডেসিমিটার—মিটার! এভাবে কমতে কমতে যখন দূরত্বটা মিটার দুয়েক তখনই দেখতুম চালে ভুল হয়ে যেত কেম্যানের। ও যদি পদ্মপাতার কার্পেটমোড়া জলের তলা দিয়ে টর্পেডোর মতো এগিয়ে এসে ঘ্যাঁক করে জাসানার ঠ্যাঙখানা কামড়ে ধরত, তাহলে আর পালাবার কোন পথ থাকত না। কিন্তু কেম্যানের বয়স কম, অভিজ্ঞতা অল্প—এই সময় সে উত্তেজনায় ভুল করে ভেবে বসত, সে বুঝি উপেন্দ্রকিশোরের বইতে রাক্ষসের পার্ট করছে। লেজের আপ্‌শানিতে হ্রদের জল তোলপাড় করে সে সাঁতরে

আসত : হাঁউ মাউ-খাঁউ। জাসানার গন্ধ পাঁউ।

জাসানা তৎক্ষণাৎ ফুড়ুৎ। বেশি উঁচুতে উঠত না—কেম্যানের মাথার হাতদেড়েক উপরে চক্রাকারে পাক খেত—'ক্যাও? ক্যাও? কেঁও?' জাসানা জানে, যত বড় রাক্ষসই হোক, ঐ দেড় হাত শূন্যমার্গের অবরোধ কেম্যান ভেঙে ফেলতে পারবে না। এদিকে কেম্যানের লেজের আপ্‌শানিতে যে শব্দ হয়েছে তাতে যাবতীয় জলচর পাখি শামিল হয়েছে আকাশমার্গের প্রতিবাদ-মিছিলে। তারা সবাই দলে দলে চক্রাকারে পাক খেতে থাকে আর স্লোগান দিতে থাকে ; নিপাত যাক নিপাত যাক! কেম্যানের সাদা দাঁত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!

এই একই খেলা নিত্যি ত্রিশ দিন।

আমি ভাবতুম—শুধু কেম্যান নয়, জাসানা-সুন্দরীও বোকার বেহদ্দ। কেন রে বাপু? এই জলাটা ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটু সরে গেলেই পারিস? সেখানেও পদ্মপাতা আছে, কোনও কেম্যান নেই। কিন্তু গবেটটা বীজগণিতের এই সহজ অঙ্কটা কষতে পারে না। সহসমীকরণের দুটি মূল : কেম্যান আর পদ্মপাতা। একটি সংখ্যাকে অপরটি দিয়ে ভাগ দিলেই—অর্থাৎ নিজে ভেগে পড়তে পারলেই—কেম্যানকে ভাগিয়ে দিয়ে পদ্মপাতায় 'মূল'-কে পাওয়া যায়। কিন্তু বেচারি জাসানা তো বীজগণিত শেখেনি—ঐ বদ্ধজলাটার একটা লালচে রঙের কাশ ঝোপের কিনারে বসে থাকে চোপর দিন।

কী মধু আছে ঐ কাশঝোপে?

একদিন কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে এগিয়ে গেলুম ঐ কাশে ঝোপের কাছে।

ও হরি! এই-কাণ্ড! মিস্ জাসানা এতদিনে মিসেস্ জাসানা। কাশঝোপের মাঝখানে, লতাপাতা কাঠকুটো দিয়ে বানানো একটা ভালো-বাসায় চারটে 'জেম-চকোলেট'। জাসানা-মা তার ওপর জাঁকিয়ে বসে 'তা' দিচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ডানা-ঝাপটিয়ে প্রতিবাদ করে ওঠে : কেওঁ। কেওঁ কেওঁ?

আমি উল্টে ধমক লাগাই, দূর পাগলি। আমি তোর ডিম চুরি করতে আসিনি মোটেই। এই দেখ আমি ফিরে যাচ্ছি। যা, 'তা' দিগে যা।

দিনচারেক জাসানাকে আর দেখিনি। কেম্যানও কী জানি কেন জলাটার দূরতম প্রান্তে সরে গেছে। ব্যাপার কী? আবার সরজমিন তদন্তে যেতে হল।



আহা-রে! জাসানার বাসাটা ফাঁকা। কিছু ভাঙা ডিমের খোলা ছড়ানো আছে এখানে-ওখানে। নিশ্চয় ঈগল অথবা প্যাঁচার কাণ্ড। গোগোও হতে পারে। কার কাণ্ড বোঝা গেল না। তাই বোধহয় জাসানা নিরুদ্দেশ। এতবড় শোকটা সামলাতে পারেনি বেচারি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। নারকীয় কাণ্ডটার জন্য দায়ী কে, তা জানা গেল না ; হলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারলেও মনটা শান্ত হত।

পরদিন বিকেলবেলা গরম কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসতেই নজরে পড়ল দৃশ্যটা। আরে, ঐ তো! জাসানা মা, আর তার চার-চারটি ছানা-পোনা।

দৃশ্যটা আমি জীবনে ভুলব না। জাসানা-শিশু তার জীবনের প্রথম পাঠ

*জাসানা মা পদ্মপাতায় একপায়ে দাঁড়িয়ে*

নিচ্ছে। মা-জাসানা বের হয়ে এল কাশঝোপের ফোকর থেকে। পেছনে ফিরে দেখল একনজর। ঠিক তার পেছনেই হাঁটি হাঁটি পা পা এগিয়ে আসছে সদ্যোজাত চারভাই : চুন্নু মুন্নু চ্যাঁ ম্যাঁ।

সবেদা ছোট মাপের হলে অথবা পাতিলেবু বড় মাপের হলে যতটা হয়, এক-একজনের তনুটি ততখানি। গোলাকার দেহের নিচে একজোড়া দেশলাই কাঠি। আর তার তলায় মাকড়শার জালের মতন ইয়া লম্বালম্বা সুতোর আঙুল। এক-একটা আঙুল গোটা দেহের মতো লম্বা। মনে হচ্ছে এক একটা মাখনের দলা কফির কৌটোয় ডুব স্নান সেরে এসেছে। সবচেয়ে মজা ওদের চলার ভঙ্গিটা। মায়ের লগেলগে পুটপুট করে বেরিয়ে এল চারভাই—একের পিছে এক। মা দাঁড়ায়, তো বালখিল্য বাহিনীও : ক্লাস হল্ট, ওয়ান-টু। শুধু তুলতুলে ঘাড়ের উপর পুঁচকে পুঁচকে মুণ্ডুগুলো ইতিউতি ঘুরছে। সবার পিছনে সবচেয়ে পুঁচকেটা আবার আকাশপানে অবাক দৃষ্টি মেলে কী যেন দেখছে। যেন বলছে : ছোদ্দা। আকাছটা অত নীল কেন রে?

জাসানা-মা পদ্মপাতায় একপায়ে দাঁড়িয়ে অপর পায়ে পদ্মপাতার কিনারাটা উল্টে ধরছে। খুঁটে তুলছে পোকামাকড়। খাচ্ছে না কিন্তু। পেছন ফিরে

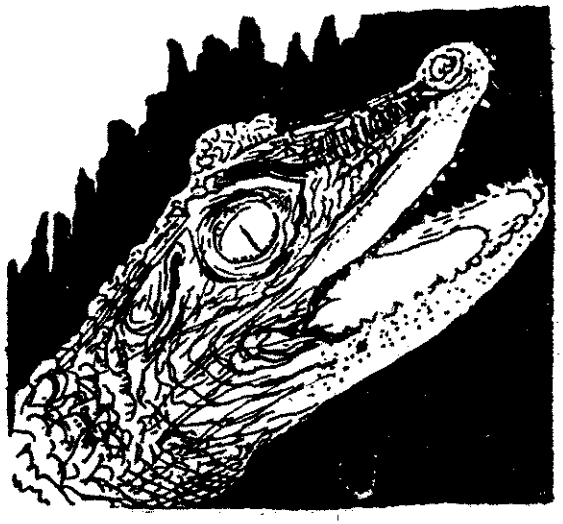

*কেম্যান নিষ্পলক দৃষ্টিতে*



খাদ্যবস্তুটা বাড়িয়ে ধরছে। চার ভাই পর্যায়ক্রমে ব্রেকফাস্ট সারছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, হৈ-হল্লা নেই। এমনটা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। যে-কোন জাতের মা-পাখি একটা পোকা নিয়ে বাসায় ফিরলেই দেখেছি সবকটা বাচ্চা হাঁহাঁ করে তেড়ে আসে। জাসানা বোধকরি পক্ষিকুলে অনেক কেতাদুরস্ত। হ্যাংলামো নেই কিছু।

মিনিটখানেকের ভেতরেই পদ্মপাতার ওই নিচের দিকটা দিব্যি ল্যাপাপোঁছা। তখন জাসানা-মা এক-পা আগিয়ে সামনের পদ্মপাতাটিতে চলে আসছেন। বালখিল্যবাহিনীও এক-এক পদ্মপাতা ডিঙিয়ে আসছেন।

হঠাৎ খেয়াল হল—কেম্যানটা এখন কোথায়? বাইনোকুলারটা ঘুরিয়ে সমস্তটা হ্রদ তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। কেম্যানের লেজের টিকিটিরও চিহ্ন নেই। চলে গেছে নিজের দলে? বাঁচা গেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে দূরবীনটা যেই আবার জাসানা পরিবারের দিকে ফিরিয়েছি, তখনই নজর হল : ওই তো।

সর্বনাশ! জাসানা পরিবার থেকে হাতদশেক দূরে সমস্ত দেহটা জলে ডুবিয়ে নাকটুকু জাগিয়ে কেম্যান নিঃসাড়ে পড়ে আছে। জাসানা-মা তো ছার, আমার সন্ধানী দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েনি। তার একটা বিশেষ হেতু ছিল। সজ্ঞানেই হোক আর ঘটনাচক্রেই হোক, কেম্যান আজ চমৎকার একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে। তার নাক-মুখ-পিঠের ওপর সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ। যেন জল্লাদের ভূমিকায় অভিনয়ের পূর্বে সে দীর্ঘ সময় গ্রীনরুমে 'মেক-আপ' নিয়েছে। ওর সেই মাতালের ঢুলুঢুলু চোখ আর নেই, লোভাতুর লাল দুটি চোখে হিংস্র খুনির দৃষ্টি। কেম্যানের নিষ্পলক দৃষ্টিতে দৃঢ় সংকল্পের মৃত্যুছায়া আজ স্পষ্ট দেখলুম। লোভাতুর, নৃশংস কিন্তু অচঞ্চল। জাসানা-মা তাকে আদৌ লক্ষ্য করেনি, সে নিশ্চিন্তে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে—ঐ দিকেই। তার গতিমুখ ঐ কেম্যানটার দিকে। অবধারিত মৃত্যুর দিকে।

ঠিক তখনই মনে হল—একটা কিছু করা দরকার। বিশ্বপ্রকৃতির একটি অতি ক্ষুদ্র নাটকের নির্বাক দর্শক সেজে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জানি, আইনত আমার নিরপেক্ষ থাকা উচিত। জাসানাকে রক্ষা করা মানে কেম্যানকে তার খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা।

কিন্তু সে সব দার্শনিক চিন্তা তখন আমার মাথায় নেই। সেই ক্ষণিক মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল—কেম্যান একবেলা অনাহারে থাকে তো থাক, জাসানা-

মার ঐ ছোট্ট সংসারটাকে বাঁচাতে হবে। ললিপপের মত ঐ চার-চারটি প্রাণী—যারা সূর্যোদয় দেখেছে, জীবনে এখনো সূর্যাস্ত দেখেনি—ওদের রক্ষা করতে হবে।

চকিতে মনে পড়ে গেল নিউটনের এক নম্বর গতিসূত্রের কথা। 'বাহির হইতে প্রযুক্ত বলের সাহায্যে অবস্থা পরিবর্তন না করিলে.....সচলবস্তু সমবেগে সরলরেখা বরাবরই সর্বদাই চলিতে থাকিবে।' 'সচল বস্তু' এখানে 'সরল বুদ্ধু'—যে সরলরেখা বরাবর চলেছে মৃত্যুমুখে। কী করা উচিত বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল। নাটকটা মঞ্চস্থ হচ্ছে বেশ কিছুটা দূরে ; যদিও আমার জোরালো বাইনোকুলার আমাকে প্রথম সারির দর্শকের আসনে বসিয়েছে। অত দূর থেকে হাততালি দিলে কাজ হবে না। ঢিল ছুঁড়লে অত দূরে পৌঁছবে না।

এক হতে পারে যদি বন্দুকটা ব্যবহার করি। কিন্তু কেম্যানকে গুলি করতে যাওয়ার বিপদ আছে। অতদূর যেতে যেতে গুলির ছর্‌রা এতটা ছড়িয়ে পড়বে যে, তাতে হয়তো জাসানা পরিবারটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু আর একটা কাজ তো করা যায়। স্রেফ ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ। বন্দুকের শব্দে সপরিবারে জাসানা আকাশে উঠে পড়বেই।

বন্দুকটা গেল কোথায়? ওই তো। কিন্তু টোটার বাক্সটা? সেটা খুঁজে বার করতে লাগল আরও পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। আমি তখন মনে মনে বলছি : কেম্যান। ঐ জাসানা পরিবারের কারও একটি পালক যদি আজ খোয়া যায়, তাহলে কাল সকালে তোমাকে চিত হয়ে হ্রদের জলে ভাসতে হবে। এ একেবারে নির্ঘাৎ। মৃত্যুর শোধ আমি মৃত্যুতেই তুলব।

বন্দুক হাতে ছুটে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। শেষবারের মতো দূরবীনটা চোখে লাগাই, শেষ অবস্থাটা সমঝে নিতে। দেখি—ঈস! জাসানা-মা এখনও টের পায়নি। পায়ে পায়ে এগিয়েই চলেছে। এখন দূরত্বটা হাততিনেক। তার মানে কেম্যানকে সাঁতরাতে হবে না আদৌ। একটি ঝাঁপের ওয়াস্তা। তখনও জাসানা-মা পরম নিশ্চিন্তে ব্যালে-নাচের ভঙ্গিতে একপায়ে পদ্মপাতায় লেখা পেরথমভাগ পড়াচ্ছেন তাঁর 'চুন্নু-মুন্নু-চ্যাঁ-ম্যাঁ-কে।

ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা।

টুপ। ডুবে গেল কেম্যানের নাকটা। অর্থ—ও এবার ঝাঁপ খাচ্ছে। এই মুহূর্তে। এক্ষুণি। দুহাতে বন্দুকটা তুলে নিয়ে আকাশ লক্ষ্য করে একসঙ্গে দুটো



ট্রিগারই টেনে দিলুম। যতক্ষণ লিখতে লাগল তার একশ ভাগের এক ভাগ সময়ে।

শব্দের গতি যেন কত? 330 মিটার প্রতি সেকেন্ডে? নয়? অঙ্ক আমি জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি—কেম্যানের হাঁ-মুখ যে খণ্ডমুহূর্তে পদ্মপাতাকে দ্বিখণ্ডিত করল, আর বন্দুকের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র যে মুহূর্তে মা-জাসানা শূন্যমার্গে লাফ মারল তার ফারাকটা মাপতে স্টপ-ওয়াচও হার মানবে। ফটো ফিনিশ ছবি চাই। কিন্তু সময়ের সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবে আমি জিতে গেছি। বাঁচিয়ে দিয়েছি সদ্য-জননীকে। মা-জাসানা শয়তানটার মাথার উপর চক্রাকারে পাক খাচ্ছে : ক্যাও-ক্যাও-ক্যাও।

কিন্তু ওর চার-চারটি ছানাপোনা? তারা তো আকাশে ওড়েনি। বোধহয় এ শিক্ষাটা তারা এখনও পায়নি। দূরন্ত আতঙ্কে ঝাঁপ দিয়েছে জলে—ঝুপ। ঝুপ। সর্বনাশ! কেম্যানটাও ডুব দিয়েছে জলে। তাড়া করছে ওদের।

জাসানা-মা হ্রদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ককিয়ে কাঁদতে থাকে, ক্যাও-ক্যাও। যাবতীয় জলচর পাখি তাকে সমবেদনা জানাচ্ছে সমস্বরে। সন্ধ্যা হতে তখনও আধঘণ্টাখানেক বাকি। অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠা পর্যন্ত চোখ থেকে বাইনোকুলারটা নামাইনি। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট কাউকেই নজরে পড়ল না ; না কেম্যান, না সেই কফিরঙের চার-চারটি ললিপপ!

বুঝলুম চারটেই ছিন্নভিন্ন হয়েছে কেম্যানের ধারালো দাঁতে।

প্রতিজ্ঞা করাই ছিল। আমি বন্দুকে নতুন করে টোটা ভরলুম। কাল রাত ভোর হলেই কেম্যানকে রওনা হতে হবে সেইখানে, যেদেশে গেছে চুন্নু-মুন্নু চ্যাঁ-ম্যা।

পরদিন সকালে বন্দুকটা ঘাড়ে ফেলে প্রথমেই গেলুম কাশঝোপটার কাছে। সেখানে জাসানা-মার দেখা পাওয়া গেল। আমাকে সে চিনে ফেলেছে। ভয় পেল না। চুপ করে বসে আছে। একা নয়, ঐতো—তার পিছনে তিনটে বাচ্চা। তিনটে? তাহলে চতুর্থটা? সেটা কোনটা? চেনা অসম্ভব। তবু আমার কি-জানি-কেন মনে হল—সেটা সেই সবচেয়ে পিছনের পুঁচকেটা। সেই যেটা কাল বিকালে আকাশপানে মুখ ফিরিয়ে বলছিল : ছোদ্দা। আকাছটা অমন নীল কেন রে?

মনটা খারাপ হয়ে গেল। গাছের গুঁড়িতে ঠেশান দিয়ে একটা সিগ্রেট ধরাই।

কী বেহুদ্দ বোকা ঐ মা জাসানা। একটু পরেই সে তার বাকি তিনটে ছানাপোনা নিয়ে রওনা হল আহারের সন্ধানে। ঠিক কালকের মতো—হাঁটি-হাঁটি-পা-পা। সবার আগে মা, আর তার পেছনে : চুন্নু-মুন্নু-চ্যাঁ....। না। যে ছিল সবার পিছনে, সেই সবার আগে হাঁটি-হাঁটি খেলা সাঙ্গ করেছে।

বাইনোকুলারটা নিয়ে আমি তন্নতন্ন করে হ্রদটা সন্ধান করি। কেম্যান বেমালুম বেপাত্তা। শয়তানটা কি টের পেয়েছে যে, আমি বন্দুকে নতুন করে টোটা ভরেছি? ও কি শুনতে পেয়েছি—কাল আমি মনে মনে কী প্রতিজ্ঞা করেছি?

সারাটা দিন ছটফট করতে থাকি। ও! কী মুশ্‌কিলে পড়া গেল! এভাবে হারাধনের দশটি ছেলের মৃত্যু দেখতে হবে? না, এ হতে পারে না। বিকালের দিকে আদিবাসী গ্রামে গেলুম। কিছু নগদ কবুল করতেই দুজন সাহসী জোয়ান আমার সঙ্গী হতে রাজি হল। একটা দড়ির ফাঁস বানিয়ে আমরা একটা ডিঙি নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি।

কাল উত্তেজনার বশে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—কেম্যানের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব। কিন্তু আজ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখছি, এটা করা আমার রীতিমত অন্যায় হবে। কেম্যান তো অন্যায় কিছু করেনি। না অপরাধ, না পাপ। সে এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি-নাটকের একজন অভিনেতা মাত্র। নাট্যকার তার চরিত্রে যে 'ডায়ালগ' দিয়েছেন সে তো সেটাই আউড়ে যাবে? তার দোষ কী? নাটকটা মিলনান্তক হবে না বিয়োগান্তক হবে, সে সিদ্ধান্ত কি অভিনেতা নিতে পারে? মা-জাসানা যখন পদ্মপাতা উল্টে ধরে কেঁচো আর জলপোকাদের খাচ্ছিল তখন তো আমি বন্দুক ঘাড়ে তাকে হত্যা করতে ছুটিনি। কেন? জলপোকাদের মৃত্যুযন্ত্রণা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি না বলে? মূল নাটকটা যাঁর রচনা—এই খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে গড়া জীবজগতের মূল নাট্যকার, তাঁকে তো কোনদিনই পাব না আমার বন্দুকের নাগালের মধ্যে।

জলাটার একেবারে দূরতম প্রান্তে কেম্যানের সন্ধান পাওয়া গেল। রোদে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে। আমি দড়ির ফাঁসটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরি। অ—তি ধীরে, ঠিক যে ভঙ্গিতে টিকটিকি শ্যামাপোকার দিকে এগিয়ে যায়, অথবা কেম্যান জাসানার দিকে—সেই সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে যাই। সেন্টিমিটার—ডেসিমিটার—মিটার। বোকাটা টের পায়নি। এক লাফে



আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ও ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠার আগেই ফাঁসটা আটকে গেল ওর গলায়।

বাকি কাজটা সহজ। জালে আলেজমস্তক জড়িয়ে শয়তানটাকে ডিঙিতে তোলা হল। কিলোমিটার খানেক উজিয়ে যেতেই দেখতে পেলুম কেম্যানের জ্ঞতিভাইরা চড়ার উপর সারি সারি রোদ পোহাচ্ছে। ডিঙির শব্দে গতর নামিয়ে এঁকেবেঁকে তারা একে একে জলে নামল। সেখানে কেম্যানকে ডিঙি থেকে নামানো হল বালির চড়ায়।

আমি বললুম, বাপুহে কেম্যান! নেহাত তোমার বাপ-দাদার পুণ্যফলে তোমার নামটা আমার 'লিস্টিতে' নেই। না হলে তোমাকে বিলাত দেশটা দেখতে পাঠাতুম। খাস লন্ডনে। আপাতত এখানেই এই চড়ায় চরাবরা কর। আমার জাসানা পরিবারটিকে তছনছ করতে যেও না। কিছু বুঝলে?

কেম্যানের মুখ বাঁধা। সে জবাব দিল না। মুখ খোলা থাকলেও অবশ্য সে জবাব দিত না, ছাড়া পেয়েই সে সড়াৎ করে নেমে গেল জলে। ডুব-সাঁতারে বিশ হাত পাড়ি সে ভেসে উঠল। মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। মনে হল, ও মনে মনে বলছে : 'মলবার মত কান নেই, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন স্যার, তাই নাক মলছি, লেজ মলছি।'

এরপর যে কয় সপ্তাহ সেই সান্তা রোজা গাঁয়ের খেলাঘরে ছিলুম পদ্মপত্রবিহারিণী আর তার খুদে ব্যালে-নাচের নবীন শিক্ষার্থীদের নাচন দেখতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

*

কী বললে? লেজখৎ দেবার পরিবর্তে কেম্যান যদি আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করত—'এ পাড়ার নতুন জাসানা-মার নতুন চুন্নু-দের....'

না! তাহলে আমি তাকে জবাব দিতুম না। কারণ ও বুঝত না। তোমরা বুঝবে। তাই তোমাদের চুপি চুপি জানাই জবাবটা ;'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায় ; কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।' খেলাঘরের খেলনা খোয়া গেলে নির্বোধের মত বন্দুক ঘাড়ে খুঁজতে থাকি সেই নিষ্ঠুর নাট্যকারকে যে নাকি পরম করুণাময়—যাঁর খেলাঘরে 'হারায় না কভু অণুপরমাণু।'

# পেটুক

মস্কো অলিম্পিকে 'ম্যাস্কট' ছিল 'মিসা', মনে আছে নিশ্চয়। কিন্তু তার আগের অলিম্পিকে? মনস্ট্রিলে? মনে পড়েছে? বীভার। টি.ভি.-তে আমরা রোজ তাকে দেখতে পেতাম। কুৎকুতে চোখ তুলে চাইছে খুরকুর করে গাছের ডাল কাটছে। এককালে পৃথিবীর অনেক দেশে ওদের দেখতে পাওয়া যেত। ওর নরম রোঁয়াওলা চামড়ার লোভে মানুষ ওদের মারতে মারতে প্রায় শেষ করে এনেছে। এখন ওদের দেখতে পাওয়া যায় শুধু উত্তর আমেরিকা আর কানাডায়।

দৈর্ঘে এক মিটার হয় কি না হয়, তার তিনভাগের এক ভাগ আবার লেজ। ওজনে সর্বোচ্চ ত্রিশ কে. জি.। ওস্তাদ সাতারু ভোঁদড়দের মতো। দক্ষ এঞ্জিনিয়ার। গাছ কেটে পাথর সাজিয়ে জলের নিচে বাসা বানায়, নদীতে বাঁধও দেয় গাছের গুঁড়ি বিছিয়ে। ভারি পরিশ্রমী ওরা। থাকে দল বেঁধে।

সেই বীভারের গল্পই আজ তোমাদের শোনাতে বসেছি। যাঁর ডায়েরি অবলম্বন করে গল্পটা খাড়া করছি তাঁর নাম আর. ডি. লরেন্স। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শিকারী, পরে জীববিজ্ঞানী। তাঁর বইটির নাম—"Paddy : A Naturalist's Stoy of an Orphan Beaver."

বইটি যোগাড় করা শক্ত। পারলে মূল গল্পটা পড়ে দেখ।

কানাডার উত্তরে অন্তারিও লেকের ধারে তাঁবু গেড়েছি আজ দিন সাতেক। উদ্দেশ্য—'বীভার' জন্তুটাকে ভাল করে লক্ষ্য করা। বীভারের দিকে নজর পড়েছিল নিতান্ত লোভীর মতো ওদের চামড়ার লোভে। ক্রমে ঐ জন্তুটাকে ভালোবেসে ফেললাম। এখনও আগের মতো শিকারে আসি ; তবে বন্দুকের বদলে ক্যামেরা আর বাইনোকুলার নিয়ে। কারণ ওদের হত্যা করতে তো আসি না আজকাল। ধরে রাখতে চাই ফটো-অ্যালবামে। আরণ্যক প্রাণীদের নিয়ে নানান গবেষণা করি, গল্প লিখি। সেসব লেখা ছাপা হয় নানান পত্রপত্রিকায়।

আমার গ্রাসাচ্ছানের ব্যবস্থা হয়।

মে মাস শেষ হয়ে এল। এখন লম্বা চার মাস এই নির্জন প্রান্তরে কাটাতে হবে আমাকে। অ্যালেক-বুড়ো বলেছে জঙ্গলের এ দিকটায় বীভারদের বাস। অ্যালেক ভুল করবে না, সে বীভার-ব্যাপারে ওস্তাদ। সারা জীবন শুধু বীভারই শিকার করে গেছে। অ্যালেক যে বাজে কথা বলেনি অচিরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বেশ কয়েকটি বীভার কলোনির সন্ধান পেয়েছি।

কেটলিতে চায়ের জলটা বসিয়ে আলু-পেঁয়াজ কাটছি হঠাৎ নজর হল হ্রদের কিনারে এক গাদা 'জে' পাখি কী নিয়ে খুব ঝগড়া বাধিয়েছে। 'জে' পাখি অনেকটা শালিকের মতো কলহপ্রিয়। জায়গাটা প্রায় তিনশ মিটার দূরে। মনে হল, ওরা কিছু একটা খাদ্যবস্তুর সন্ধ্যান পেয়েছে। আর তার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এই সাত সকালে লড়াই-কাজিয়া শুরু করে দিয়েছে। ব্যাপারটা সরেজমিনে একবার দেখতে হয়। আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে সেদিকপানে রওনা দিই। কয়েক মিনিট পরেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্রদের কিনারে পড়ে আছে একটা মৃত বীভারের দেহের আধখানা। নিশ্চয়ই নেকড়ের কাণ্ড। সকাল হয়ে যাওয়ায় নেকড়েটা লুকিয়েছে। এখন 'জে'-পাখির দল এসেছে ভাগ নিতে। মৃত জন্তুটাকে পরীক্ষা করলাম। মাদি বীভার। আরও লক্ষ্য হল, সে সদ্য জননী হয়েছিল। ওর তলপেটে তখনও দুধে টইটুম্বুর। আহা বেচারি। কিন্তু তখনই মনে প্রশ্ন জাগল—তাহলে বাচ্চাগুলো কোথায়? আশেপাশের ঝোপঝাড়ে অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোন মৃত বীভার-শিশু দেখতে পেলাম না। বীভার একসঙ্গে দু-তিনটে বাচ্চার মা হয়—বেড়ালের মতো—এরও নিশ্চয় তাই হয়েছিল। তাহলে বাচ্চাগুলোর একটাও কি বেঁচে নেই? এমনটা হতে পারে না। কিছুতেই নয়।

ছুটে ফিরে এলাম তাঁবুতে। ডিঙি নৌকোটা নিয়ে বাইনোকুলার হাতে তখনই বের হয়ে পড়লাম। হ্রদের কিনার বরাবর সমস্ত তল্লাটটা আঁতিপাতি করে খুঁজলাম! এ জায়গাটায় গোটা-ছয়েক বীভার-কলোনি নজরে পড়েছে আমার। তার ভিতর একটা খুবই কাছে। আমি প্রথমেই সেই বীভার-কলোনির কাছে চলে আসি। জামা-জুতো খুলে নেমে পড়ি জলে।

বীভারদের বাসা জলের তলায়। অদ্ভুত কায়দায় গাছ আর পাথর দিয়ে ওরা সেই বাসা বানায়। সে-সব কথা আগেই বলেছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম।



একটাও জ্যান্ত বীভারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। আমাকে দেখেই পুটুস-পাটুস সব লুকিয়ে পড়েছে। কোন সদ্যোজাত শিশুর আভাসমাত্র নেই।

অগত্যা ফিরে এলাম। অতটুকু বাচ্চা কি জলের তলায় থাকতে পারবে? ঠিক জানি না। শুনেছি, বীভারের বাচ্চা হয় ডাঙায়; নদীর ঠিক কিনারে। জলের নিচে নয়। জন্মের কতদিন পরে মা ওকে জলে নামা শেখায়? কিছুই জানি না। অ্যালেক বুড়ো থাকলে এসব কূট-কচালে প্রশ্নে ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারত।

সারাটা দিন হ্রদের কিনারে কিনারে নৌকো বাইলাম। সদ্যোজাত কোন বীভারের সন্ধান তো ছার, আভাসই পাওয়া গেল না। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন খেয়াল হল—সারাদিন আমি পাগলের মতো পাক মেরেছি; মধ্যাহ্ন আহারটাও করা হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা যখন ক্যাম্পে ফিরে এলাম তখনও অন্ধকার হয়নি। আলো-আঁধারি অবস্থা। রান্না চাপাবার আয়োজন করছি, হঠাৎ মনে হল হ্রদের কিনারে একসাথে অনেকগুলো জলচর জীব ডেকে উঠল। একঝাঁক হাঁস উড়ে গেল আকাশে। নিশ্চয় কোনো বিপদের সঙ্কেত। পাখিরা এভাবেই পরস্পরকে জানান দেয় বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সেদিকে ফিরে দেখি একটা বড় জাতের বাজপাখি বারে বারে পাক খেয়ে নিচে নামতে চাইছে—পারছে না—আবার উঠে যাচ্ছে। ঠিক যেখানটায় সকালবেলা সেই মৃত বীভার-জননীকে দেখেছিলাম।

বাইনোকুলারটা তুলে নিয়ে দেখি, সেই মৃত পশুটার দেহ সেখানে নেই। নেকড়েটা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তা সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক সেখানেই কী-একটা পুঁটুলি মতো রয়েছে। যার উপর ঐ দৈত্যাকার পাখিটা বারে বারে ঝাঁপ খেয়ে পড়েছে, আর উঠ্‌ছে। ওখানে কোনও শিকার থাকলে বাজপাখিটা এভাবে বারে বারে ডাইভ দেবে কেন? বাজপাখির তো অব্যর্থ লক্ষ্য! প্রথমবারেই সে তো তুলে নেবে হতভাগ্য প্রাণীটাকে? আর জঙ্গলে এমন গবেট প্রাণীই বা আসবে কোত্থেকে যে প্রথমবার বাজপাখি ব্যর্থ হওয়া মাত্র চোঁ-চোঁ ছুট লাগাবে না? তখন নজর হল—ঠিক ঐ জায়গাটাতেই গোটা দুই গাছ উপড়ে পড়েছে—সুতীক্ষ্ণ ডালপালা সমেত শিকড়গুলো ঊর্ধ্বমুখে এমনভাবে রয়েছে যে বাজপাখিটা ঠিকমতো নামতে পারছে না। আর সেই সাদা মতো পুঁটুলিটা—না, না, ওটা পুঁটুলি নয়! একটা জ্যান্ত বীভার।

বীভার? ঐ অত্তটুকুন?

তখনই বুঝতে পারলাম—এই আমার সেই হারানো মানিক, যাকে সারাদিন আঁতিপাতি করে খুঁজেছি। সদ্যোজাত বীভার শিশু।

আমি চিৎকার করে উঠি। দু-তিনটে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম বাজপাখিটার দিকে, সে ভ্রূক্ষেপও করল না। ক্রমাগত চক্রাকারে পাক খেতে থাকে। কীভাবে, কোন মুখে নামবে তার তাল ভাঁজছে। পুঁচকেটা এতবড় ইডিয়েট—এই সুযোগে কোথায় গাছের নিচে, গর্তের ভিতর, নিদেন জলে ঝাঁপ খেয়ে পালাবি, তা নয়! ভয়ে বোধহয় ওর হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। মাত্র কয়েকঘণ্টা বয়স তার! মৃত্যুভয় কী, তা কি ও এই কয় ঘণ্টাতেই শিখে ফেলেছে? ফেলা সম্ভব?

ওসব দার্শনিক চিন্তা পরে করা যাবে। আপাতত প্রথম কাজ পুঁচকেটাকে উদ্ধার করা। ডিঙিটা নিয়ে আমি ছপ্‌ছপ করে এগিয়ে চলি ওদিকে। বাজপাখিটা ঠিক তখনই আবার ডাইভ দিল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। পারেনি। এবারেও পারেনি। পাখিটা আবার উপরে উঠে গেল। এবার নৌকার দাঁড়টাকে আমি সজোরে নৌকার গায়ে ঠুকলাম। অনেকটা বন্দুকের শব্দ যেন। পাখিটা আরও উপরে উঠে গেল। আবার গোল হয়ে পাক খেতে থাকে। ততক্ষণ ডিঙি নিয়ে আমি পৌঁছে গেছি। বাজপাখিটা শেষবারের মতো ঝাঁপ খাওয়ার আগেই আমি ডিঙি থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ি।

আমার মুঠোর মধ্যে ততক্ষণে ধরা পড়েছে পুঁচকেটা। একমুঠো তুলো যেন। একশ গ্রামের বরিক-কটনের একটা প্যাকেট। কয়লাকালো একজোড়া কুৎকুতে চোখ। অবাক কাণ্ড। ওমা। অ্যাত্তটুকু বাচ্চার আবার গোঁফ!

পুঁচকেটাকে আমি ততক্ষণে ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছি। কী কাণ্ড। আমার বুড়ো আঙুলটাকে চুষছে!

তাঁবুতে ফিরে এসে পকেট থেকে ওটাকে বার করলাম। বেচারি ভয়ে মর-মর। ভয়ে, অথবা খাদ্যাভাবে ঠিক জানি না। একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। মনে হল, জন্মের পর ও বোধহয় মায়ের দুধ খাবার সুযোগ পায়নি। কী প্রাণশক্তি! তারপর বিশ-বাইশ ঘণ্টা বেঁচে আছে।

গুঁড়ো দুধের টিন ছিল। আর ছিল একটা 'আই-ড্রপার'। কিন্তু সেসব কথা পরে। প্রথমেই ওর মুখটা ফাঁক করে আমি ফুঁ দিলাম। অক্সিজেনটা দরকার।



তাছাড়া আমার গন্ধটাও সে চিনে রাখুক। পুঁচকেটা একবার চোখ মেলে তাকালো। কী দেখল, তা সেই জানে। আমি নিঃসঙ্কোচে জিভটা বার করে ওর মুখটা চেটে দিলাম—কারণ, আমার মনে হল, ওর মা নিশ্চয় তাই করত। আমিই তো এখন ওর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছি। পুঁচকেটা খুশি হল, সেও তার একফোঁটা জিভ দিয়ে আমার ঠোঁটটা চাট্‌তে থাকে। ওকে আমার কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে চট্ করে স্টোভটা জ্বেলে আমি আধ কাপ দুধ বানিয়ে ফেলি। দুধের গুঁড়ো কতটা দেব স্থির করতে বেশ বেগ পেতে হল। গরুর দুধ এদের পক্ষে দুষ্পাচ্য—তাছাড়া অনাহারে আর জলীয় বস্তুর অভাবে এমনিতেই ওর দেহ নির্জীব। ফলে জল ও দুধের পরিমাণ ঠিক হওয়া চাই।

দুধের ঘনত্ব আর উত্তাপ ঠিক মতো পরীক্ষা করে নিয়ে এবার কম্বলটা

*'—এবার আইড্রপারটা চুষতে থাকে'*

সরিয়ে দিই। দেখি, পুঁচকেটার দু-চোখ বোজা। একেবারে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। মরে গেল নাকি? বাঁ হাতে আই-ড্রপারে কয়েক ফোঁটা দুধ নিয়ে ওর মুখের কাছে ধরলাম। মুখটা হাঁ করছে না। দু-আঙুলে মুখটা জোর করে ফাঁক করে দু-এক ফোঁটা দুধ দিলাম। তখনই ও চোখ চাইল। মাতৃস্তনের বোঁটা মনে করে এবার আই ড্রপারটা চুষতে থাকে। পাঁচ-সাত ফোঁটা খাওয়ানোর পর আমি মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করি। পুঁচকেটা ততক্ষণে রীতিমতো ছটফট করছে। তা-হোক, অতি ধীরে ধীরে ওকে খাওয়াতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। প্রায় আধঘণ্টা সময় নিয়ে আধকাপ জোলো দুধ ওকে খাওয়ালাম। কী রাক্ষুসে ক্ষিদে। আরও খেতে চায়। কিন্তু না। এখন আর দেব না ওকে। আবার কম্বলের তলায় ওকে শুইয়ে দিই।

ঘণ্টা-দুয়েক নাগাড়ে ঘুমোলো। ততক্ষণে আমি চালে-ডালে একটা খিচুড়ি মতো বানিয়ে ফেলেছি। না! পুঁচকের জন্য নয়। নিজের জন্যে। তোমরা ভুলে গেলেও আমি কেমন করে ভুলি যে, আমার পেটেও সারাদিনে একটিমাত্র দানা পড়েনি। মোট কথা, সারা রাত জেগে প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর ওকে দুধ খাওয়ালাম। রাত তিনটে নাগাদ ও বেশ আরাম করে শুয়ে পড়ল। আমিও ওর পাশটিতে শুয়ে পড়ি। এক-পেট খাবার পরেও ও আমার আঙুলটা চুষতে থাকে। আমি ঘুমের ঘোরেই ধমক দিই : অ্যাই, কী হচ্ছে! পেটুক কোথাকার!

পেটুক। বাঃ! দিব্যি নামটা! ঐ নামই বহাল হল শেষ পর্যন্ত। ওকে আমি তারপর 'পেটুক' নামেই ডাকতাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি পেটুকটা আমার আগেই উঠেছে। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বালিশে আরাম করে বসে গোঁফ চুমড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে ওর জন্য আবার দুধ বানাই। এবার গুঁড়ো-দুধ আর আধ চামচ বেশি দিয়েছি। পেটুক দুধের গন্ধটা ইতিমধ্যে চিনে ফেলেছে। তিনলাফে এসে বসল আমার কোলে। আই-ড্রপারটা মুখের কাছে ধরতেই চুক্-চুক্-চুক্-চুক্। এক মিনিটেই খতম। একপেটে খেয়ে এবার চড়ে বসল আমার কাঁধে। কিছুতেই নামবে না। অগত্যা ওকে কাঁধে নিয়েই আমি প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে থাকি।

আজকের সকালটা রোদ ঝলমল। পাখ-পাখালি পাড়ায় কত রকমের কলরব। এ বিজন বনের ত্রিসীমানায় লোকবসতি নেই। শিকার করা এখানে



বারণ। তাই পাখিগুলো বেশ বেপরোয়া। কাছে গেলেও উড়ে পালায় না।

হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, শুনলাম একটা চিৎকার। উপরে তাকিয়ে দেখি—সেই বাজপাখিটা। এখনও সে আশা ছাড়েনি। আমার তাঁবুকে কেন্দ্র করে সেটা ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ডেকে উঠ্ছে। ওর সেই তীক্ষ্ণ ডাকটাকে অনুবাদ করলে বোধ হয় দাঁড়ায়—হাঁউ-মাউ-খাঁউ! বীভারের গন্ধ পাঁউ!

পেটুক ত্রিং করে লাফ মারে আমার কাঁধ থেকে। মুখখানা কোথায় লুকাবে ভেবে পায় না। দেখ্-না-দেখ্ আমার প্যান্টের ফাঁদলে পায়ের দিক থেকে সেঁদিয়ে গেল সুরুৎ করে। ধরতে না ধরতেই সে আমার হাঁটু-জংশন পার হয়ে পৌঁছে গেল কুঁচকি-স্টেশনে!

অনেক কষ্টে তাকে বার করে আনি। বুঝতে পারি, দেড় দিনের বাচ্চা হলেও মৃত্যুকে সে চিনেছে। মৃত্যুভয় সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল। বাজপাখির ঐ ডাকটায় যে মৃত্যুর ছোঁয়া আছে এ বোধ তার আছে। জন্মগত সংস্কার! বাঁচবার তাগিদে এ-বোধ নিয়েই সে ঐ ছোট্ট দেহটা সমেত এসেছে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে। অ্যালেক-বুড়ো বলেছিল, জন্মের পর প্রথম দুই সপ্তাহ বীভার-বাচ্চা মায়ের হেপাজতে বাসার গর্তে লুকিয়ে থাকে। একটু শক্ত-সমর্থ না হলে মা তাকে বাইরে বার করে না। তখনই স্থির করলাম, ওর জন্যে ডাল-পালা পাথর দিয়ে একটা বীভারলজ বানাতে হবে। জলের ভিতর নয়, এই তাঁবুর মধ্যেই।

কিন্তু আমি তো আর বীভারদের মতো পাকা এঞ্জিনিয়ার নই, তাই বীভার-লজটা দেখতে হল একটা পিরামিডের মতো। তবে কাদা দিয়ে ফাঁক-ফোকর সব মেরামত করে দিলাম। তাতে ভিতরটা হলো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। নতুন বাসাটা পেটুকের খুব পছন্দ হল। ছেড়ে দিতেই সেঁদিয়ে গেল ভিতরে। সুড়ঙ্গের মুখে একটা পাথর চাপা দিয়ে রাখতাম, যাতে দেখ্-না-দেখ সে বেরিয়ে না আসে। প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর তাকে দুধ খাওয়াতে হত। নাম ধরে ডাকলেই সে পুটুস্ করে বেরিয়ে আসত! নেহাত সাড়া না দিলে হাত ঢুকিয়ে পাকড়াও করে আনতাম। এভাবেই দিন-সাতেক গেল কেটে।

হপ্তাখানেকের মধ্যেই মনে হল পেটুক বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। তাঁবুর বাইরে যায় না, তবে আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখে। এখন ওকে ড্রপারে করে দুধ খাওয়ানো মহা বখেড়ার ব্যাপার। ওর তরফে এবং আমার তরফে। খাদ্যের

চাহিদা ও পরিমাণ দুটোই বেড়ে গেল ইতিমধ্যে। ড্রপারে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুধ খাওয়ানো না পোষায় আমার, না পেটুকের। একটা ডিস্-এ ঢেলে ওকে দুধ খেতে দিলাম। বোকাটা কিছুতেই তাতে মুখ ছোঁওয়াবে না। অনেক বাবা-বাছা, সোনামণি-লক্ষ্মীমণি বলে আদর করলাম ; কিন্তু জেদী একগুঁয়েটা ভালোকথার মানুষ না। এ ক্ষেত্রে বীভার-মা কী করে জানি না, কিন্তু মানুষ-বাচ্চার মা কী করে তা জানা আছে। আমিও সেই পদ্ধতিতে অগ্রসর হই। ক্যাঁক্ করে ওর টুঁটি টিপে ধরে মুখটা জোর করে ডুবিয়ে দিই দুধের মধ্যে আর গাল পাড়ি : লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর! ধেড়ে হয়ে গেলে, এখনও ফিডিং বোতল!

পেটুক প্রচণ্ড প্রতিবাদ করল। হাত-পা ছুঁড়ে একসা করল। যেন চিল চেঁচান চ্যাঁচাচ্ছে : 'খাব না, খাব না, কক্ষনো খাব না!' কিন্তু দুধের স্বাদ পেতেই চিল-চেঁচানি বন্ধ হল। বুদ্ধির ঢেঁকির এতক্ষণে মালুম হল—ওটা খাদ্যবস্তু। ব্যস্! চুক্-চুক্ করে শুরু হয়ে গেল দুধ খাওয়া। আবার মাঝে মাঝে নাকটা তুলে ফুঁ-স্ করে দুধ ছিটোচ্ছে। তা সে যাই হোক, যতই ছড়াক, ছিটোক, একদিনের মধ্যেই প্লেট থেকে দুধ খাওয়ার বিদ্যায় পেটুক সাবালকত্ব লাভ করল।

প্রথম সপ্তাহটা পেটুককে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁবুর বাইরে বড় একটা যেতেই পারিনি। তাঁবুটার দরজা বন্ধ করা যায় না। আমার অনুপস্থিতিতে কোন শেয়াল বা নেকড়ে এসে ওকে আক্রমণ করতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহে মনে হল তাঁবুর আনাচে-কানাচে কে বা কারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু নানা রকম শব্দ শুনতে পাই। একদিন খুটখাট শব্দ হতেই আমি ছোরাটা তুলে নিয়ে এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অমনি দুদ্দাড়িয়ে কী একটা ছুটে পালিয়ে গেল। বেশ অনেকটা ছুটে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে জন্তুটা ঘুরে দাঁড়াল। ও হরি। নেকড়ে বা হায়না নয়, একটা বীভার! বেশ বড় সাইজের। মদ্দা। এটা কি পেটুকের পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব? মাতৃহীন সন্তানের তত্ত্বতালাশ নিতে এসেছে? কন্যাকর্তা যে ভঙ্গিতে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করে তেমনি ভঙ্গিতে আমি দূর থেকে অনেক 'আস্তে-আজ্ঞা হোক্' করলাম; কিন্তু বীভার-কর্তার সাহস হল না। তিনি ইতি-উতি তাকিয়ে শেষমেশ জঙ্গলে সেঁদিয়ে গেলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই পেটুক বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। বীভার নিরামিষাশী, তাই ওকে আজকাল দু-এক টুকরো ফলমূলও দিচ্ছি।

আপেল ন্যাসপাতি, কলা। কেটে ছাড়িয়ে দিলে ওর জুত হয় না। গোটা



ফলটা ওর নাকের ডগায় ধরে দাও—দু-পায়ে আঁকড়ে ধরে কুটুর-কুটুর করে দু-মিনিটেই সাফ্। খাবে আর ছড়াবে! আর গোঁফ চুমড়াবে।

বীভার উভচর। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল—পেটুকের বয়স তিন সপ্তাহ হতে চলল অথচ ওকে জলে ফেলা হয়নি। এটা ঠিক হচ্ছে না। সে দিনই ওকে নিয়ে গেলাম একটা ঝরনার কিনারে। জল এখানে খুব কম—আমার হাঁটু-জল। পেটুক যে ডুবে যাবে না এটা আমি স্থির-বিশ্বাসে জানতাম। জন্ম থেকেই ওরা সাঁতারে ওস্তাদ—কিন্তু পেটুক কিছুতেই জলে নামবে না। এ কী বিপদ! যতবার ওকে জলের দিকে টেনে আনি ততবারই ও হাঁক-পাঁক করে পালিয়ে আসে। যেন নবমীর বলির পাঁঠাকে স্নান করানো হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে তোমরা কী করতে? আমিও তাই করলাম! ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে। প্রথমটা একটু হাঁকু পাঁকু! খব্ল-খব্ল। নাক-মুখ দিয়ে জল ছিটানো। তারপরেই ব্যস্! খপ্-খপ্ করে সাঁতার কাটতে থাকে। এরপর অবস্থাটা গেল উল্টে! আমি যত ডাকি—'ও পেটুক! আর না, লক্ষ্মী-সোনা, এবার উঠে আয়, ঠাণ্ডা লাগবে!'

কে কার কথা শোনে!

শেষ পর্যন্ত প্যান্ট ভিজিয়ে আমাকেই নামতে হল জলে। ওকে পাকড়াও করতে। হাড় বদ্‌মায়েস, ভাবল এ বুঝি এক নতুন খেলা। সাঁতরে আমার নাগালের বাইরে পালিয়ে যায়। সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে ওকে পাকড়াও করলাম!

তৃতীয় সপ্তাহের শেষাশেষি দেখি আমার ভাঁড়ারে ভবানী। কফি, দুধ, চিনি, বিস্কুট সবই বাড়ন্ত! অর্থাৎ বাজারে যেতে হবে। বাজার প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। একটা আধা শহরে। পেটুককে একলা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে তাকেও সঙ্গে নিতে হল। সেদিক থেকে পেটুক খুব বুদ্ধিমান। যতক্ষণ ড্রাইভ করছিলাম ও আমার ওভারকোটের পকেটে টেনে এক ঘুম দিল।

মালপত্র কিনে ফিরে এলাম পরের দিন। ঘর-দোর গুছিয়ে এবার আমি পেটুককে নিয়ে নিজেই স্নান করতে গেলাম। জামা-জুতো খুলে জলে নামবার আগে পেটুককে বসিয়ে দিলাম ঘাটের কিনারে। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মারল জলে। এটা ঝরনা নয়, বড় হ্রদটা। এখানে ওর ডুবজল ; কিন্তু পেটুক একটুও ভয় পেল না। ডুব জলে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে আবার—আমি নেমেছি কি না। দু-জনে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটা গেল। পেটুক বাচ্চা হলে কি-হয়, আমার চেয়ে সে সাঁতারে দড়। ঐ ছোট্ট হাত-পা লেজ নেড়ে সে আমার চেয়ে অনেক

জোরে এগিয়ে যেতে পারে। এখন ওর বয়স দেড় মাস ; ওজন আন্দাজ তিন কিলো। এত ভালো সাঁতার জানে যে, আমার নাগালের বাইরে দিয়ে অনেক বড় বড় চক্কর মেরে আসছে। ঘণ্টাখানেক স্নানের পর উঠ্‌ব উঠ্‌ব ভাবছি, হঠাৎ নজর হল—কী একটা জলজন্তু দূর থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখানে হ্রদে হিংস্র জীব কিছু নেই—ভয় পাওয়ার কারণ নেই ; কিন্তু পেটুক কোথায়? তখনই নজর হল—ঐ জলজন্তুটা আমার দিকে আসছে না। সে এগিয়ে যাচ্ছে পেটুকের দিকে।

পেটুক তখন আমার কাছ থেকে প্রায় একশ মিটার দূরে। জন্তুটা তীরবেগে ওর দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরেই সে আর্তনাদ করে উঠ্‌ল। তীব্রগতিতে সে আমার দিকে সাঁতরে আসতে থাকে। আমি কিন্তু একটুও ঘাবড়াইনি। কারণ আমি চিনতে পেরেছিলাম ঐ জন্তুটাকে। সেই ধাড়ি মদ্দা বীভারটা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে ঐ মা-হারা পেটুকের বাবা।

ধাড়ি বীভারটা ওর পাশে-পাশে সাঁতরে এগিয়ে এল আমার দিকে। দু-একবার বোধ হয় পেটুককে স্পর্শ করেছিল—আর তখনই চিল-চোঁচানো চিল্লে উঠ্‌ছিল পেটুক। ওরা যখন আমার থেকে হাতপাঁচেক দূরে তখন ধাড়ি বীভারটা থেমে পড়ল। জল থেকে মাথা তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কী-যেন দেখল। পাঁচ-সেকেন্ড এক-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার তলিয়ে গেল হ্রদের জলে।

আমার কী জানি কেন মনে পড়ে গেল—অনেক অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা। আমি তখন বছর-দশেকের বাচ্চা। ড্যাড্ আমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিতে এসেছেন। হস্টেল-সুপারিন্টেন্ডেন্টের হেপাজতে আমাকে পৌঁছে দেবার পর ঐ ভাবে বাবা তাঁর দিকে পাঁচ-সাত সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

সেদিনই আমার খেয়াল হল ব্যাপারটা। হয়তো পেটুকের বাপের সেই চাহনিটাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল : বীভার কিন্তু অ্যালসেশিয়ান কুকুর নয় যে, পেটুককে নিয়ে অবকাশ-অন্তে লোকালয়ে নিয়ে যাব। ও যেভাবে আমার পোষ মেনেছে, তাতে অবশ্য শহুরে জীবনেও ওকে অভ্যস্ত করা যায়। কিন্তু সেটা অন্যায় হবে! ঘোরতর অন্যায়। শুধু ওর প্রতি অন্যায় নয়, প্রকৃতিকেও আমি বঞ্চিত করব একটি বীভার থেকে। এমনিতেই শিকারীরা মেরে মেরে ওদের প্রায় নির্বংশ করে এনেছে। আমি যদি পেটুককে আদর দেখাতে সঙ্গে



নিয়ে যাই, তাহলে সেই অন্যায়ের সায় দেওয়া হবে। স্বভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে বন্দীজীবনে ওকে আবদ্ধ করার সঙ্গে হত্যার ফারাকটা খুব বেশি কিছু কি? নাঃ! যাবার সময় পেটুককে এই বিজন বনেই ছেড়ে যেতে হবে। এই গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, হ্রদের জল এমন কি ঐ বাজপাখি-শেয়াল-নেকড়ের যে প্রাকৃতিক রাজ্য সেখানেই ওর স্থান। আর সেটাই যদি চরম লক্ষ্য হয় তাহলে ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশে ওকে এখন থেকেই অভ্যস্ত করাতে হবে। যেভাবে ওর বাঁচার কথা। স্বজাতীয়ের সঙ্গে ওকে মিশতে দিতে হবে—আত্মরক্ষায় দক্ষ করে তুলতে হবে—অর্থাৎ আমাকে গুটিয়ে আনতে হবে ওর এই কৃত্রিম জীবন থেকে।

যে-কথা সেই কাজ। এই পর্যায় থেকে শুরু হল আমাদের জীবনের জটিলতা। পেটুক কিছুতেই বীভার-পাড়ায় যাবে না। আমি যদি বেশিক্ষণ ওর চোখের আড়ালে থাকি তাহলে ও চিল্লাতে থাকে। রাগ করে, অভিমান করে, বোকাটা বুঝতে পারে না—কেন আমি নিজেকে সরিয়ে আনতে চাইছি ওর জীবন থেকে। কেন ওকে আদর করি না, কেন ওকে নিজের হাতে খাইয়ে দিই না আজকাল। খাবার আমি এরপর থেকে তাঁবুর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ফেলে রেখে দিই—ও ইচ্ছামতো খুঁজে বার করুক, খুঁটে খাক। এটা হবে আহার্য সংগ্রহের প্রথম পাঠ। কিন্তু আদুরে গোপালের তা পছন্দ নয়। তিনি আমার কোলে বসে খাবেন। আমি ওঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে 'কাগের দলা, বগের দলা' খাওয়াবো তবে নবাবপুত্তুরের খাওয়া হবে। ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়!

বীভারদের জীবনযাত্রা বড় বিচিত্র। আগেই বলেছি, জলের নিচে বিচিত্র 'বীভার-লজ' বানিয়ে ওরা বাস করে। নিচের দিকে—জলের তলায়—তা হাত-পাঁচেক চওড়া, উপর দিকটা সূচালো! পাথর-নুড়ি কুড়িয়ে এনে ওরা এই বাসা বানায়। এঁটেল মাটি দিয়ে ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে। বীভার লজের এঞ্জিনিয়ারিং কারিগরীর কথা আগের গল্পটিতেই বিস্তারিত বলেছি। কিন্তু আমার পেটুক-সোনা কি অমন একটা 'বীভার লজ' বানাতে পারবে? আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। দোষ ওর নয়, ওর ভাগ্যের! কারণ ওর জীবনটা শুরু হয়েছে কৃত্রিমতা দিয়ে। বাধ্য হয়ে দায়িত্বটা আমি নিজেই গ্রহণ করি। বীভারদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গাছ কেটে, পাথর সাজিয়ে বর্ষার জলধারাকে আটকানো আমার কম্মো নয়! তাই সেই আধা শহরের বাজার

থেকে কিনে নিয়ে এলাম একটা তারের জালতি। হ্রদের এক কোনায়—ওর বাপের লজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে—একটা জায়গায় জলের ভিতর পুঁতে দিলাম অনেকগুলো গাছের খুঁটি। তারপর তারের জালতিটা আটকে দিলাম পেরেক ঠুকে। খুঁটির বাইরে দিয়ে নয়, ভিতর দিয়ে ; যাতে আমার বোক-চন্দর পেটুক-সোনা দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খুঁটিগুলোকে কাত করতে না পারে। তারপর ঐ জাল্‌তি-ঘেরা অংশটায় পাথর সাজিয়ে একটা চমৎকার লজ বানিয়ে ফেলি।

পেটুকের পছন্দ হল। সুরুৎ করে আমার কাঁধ থেকে নেমে ঢুকে গেল লজের সুড়ঙ্গের ভিতরে। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল আবার। আমার দিকে ফিরে কিচির-মিচির করে কী যেন বলতে চায়। ও বোধকরি আমাকে বলেছিল, 'আরে এমন সুন্দর একটা লজ থাকতে তুমি তাঁবুতে কেন থাকবে? এস, এখানেই আমরা দুজন থাকব।'

আমি কর্ণপাত করলাম না। ফিরে এলাম তাঁবুতে।

নতুন বাড়ি পেটুকের পছন্দ হল বটে কিন্তু এতদিনের অভ্যাসটাও সে ছাড়তে নারাজ। রোজই সকাল-বিকাল সে এসে হাজির হয় আমার তাঁবুতে। ভাবখানা—'কই হে? খিদে পেয়েছে, আমার খানা লাগাও।'

আমি ধমক দিই, 'পেটুক। যথেষ্ট বড় হয়েছ! এবার থেকে নিজের খাবার তুমি নিজে যোগাড়ের ব্যবস্থা দেখ! আমার রোজগারে ভাগ বসাতে লজ্জা হয় না তোমার?' পেটুক পেট চুলকায়। মিটমিট করে তাকায়। যেন বলতে চায়, সে বাপু আমার দ্বারা হবে না!

তা বলুক, আমি কিন্তু বুঝতে পারি, পেটুক তার স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এখন আর সকাল-সন্ধ্যা নয়, দিনে একবার মাত্র হাজিরা দেয়। তারপর দু-একদিন বাদে বাদে। তার মানে, নিজের খাবার সে নিজেই সংগ্রহ করছে। না হলে—যা পেটুক—দু-দিন উপোস করে থাকার পাত্র সে নয়।

ক্রমে আমার ফেরার সময় হয়ে এল। এতদিনে পেটুক রীতিমতো স্বয়ম্ভর হয়ে গেছে। এবার আমি তারের জাল্‌তিটা সরিয়ে দিলাম। মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে আর কোনো অসুবিধা রইল না তার।

তবুও মাঝে মাঝে আমার তত্ত্বতালাশ নিতে আসে। কোনদিন বা আমি ওর



লজের কাছে যাই। একসঙ্গে স্নান করি। মাঝে মধ্যে ওকে হাতে করে খাইয়েও দিই। রোজই বিদায় নেবার সময় সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বোকাটা কিছুতেই বুঝতে চায় না—কেন আমি ওর লজের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ি না। যেন বলতে চায়—'আমি তো তোমার তাঁবুর ভিতর ঢুকি। তাহলে তুমি কেন আমার লজের সুড়ঙ্গে আসবে না?'

আমি বলি, 'বোকা! আমার দেহটা কি ঐ সুড়ঙ্গপথে যেতে পারে?'

বোকাটা তা বোঝে না। যেন বলে, 'আড়ি! আড়ি! আড়ি!'

ক্রমে শীত এসে গেল। এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে। এখানে প্রচণ্ড শীতে হ্রদের জলের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে যায়। তখন বীভারদের খাদ্য মেলাই ভার! বীভারেরা তাই শীত আসার আগেই যথেষ্ট পরিমাণ ফল-মূল সংগ্রহ করে রেখে দেয় লজের ভিতরের ভাঁড়ার ঘরে। এ তথ্যটা আমি জানি—বই পড়ে জেনেছি—কিন্তু পেটুক কি তা জানে! কেমন করে ওকে বোঝাই? নাঃ! সে চেষ্টা আমি করব না। প্রকৃতি নিজেই নিশ্চয়ই তাকে এ সত্যটা শিখিয়ে দেবে। দেখা যাক।

একদিন সকালে উঠে দেখি আগের দিন রাত্রে বছরের প্রথম বরফ পড়েছে। সবুজ ঘাসের উপর তুলো-পেঁজা বরফের একটা সাদা আস্তরণ। স্থির করলাম, এবার পালাতে হবে। সারাটা দিন গেল গোছ-গাছ করতে। পেটুক সেদিন এল না। ভেবেছিলাম, যাবার আগে ওর কাছে বিদায় নিয়ে যাব। হতভাগাটা এলই না সারা দিনে! তা ওর আর দোষ কী? ও কি জানে যে, আমি চলে যাচ্ছি?

সন্ধ্যায় তাঁবু গুটিয়ে আমি রওনা দিলাম। পেটুক তখনও না-পাত্তা। অন্ধকারের দিকে হাতটা বাড়িয়ে আপন মনেই বলি 'সাবধানে থাকিস রে! বড় জবর শীত আসছে!'

প্রায় সাত মাস পরের কথা।

সারাটা শীতকাল আমি ছিলাম শহুরে আরামের ভিতর। ক্লাব, সিনেমা, বার—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বসার ঘর, গরম জলে স্নান আর ফায়ার-প্লেস। পেটুকের কথা ভুলেই গেছি। ধরে নিয়েছি, সে তার স্বাভাবিক জীবনে এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা ভালো চাকরির অফার পেয়ে

গেলাম। যেতে হবে দেশের অপরপ্রান্তে। দিন পনেরোর মধ্যে নতুন চাকরিতে জয়েন করতে হবে। বন্ধুরা বলল, 'চল, এ কয়দিন কোথাও গিয়ে হুল্লোড় করে আসি। কোন টুরিস্ট স্পট-এ।'

তখনই হঠাৎ মনে পড়ে গেল পেটুকের কথা। সাতদিনের ছুটি কাটাতে কোন আলো-ঝলমল টুরিস্ট-প্যারাডাইসে যেতে মন সরল না। সেই বিজন প্রান্তে হ্রদটা যেন আমাকে টানতে থাকে। এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে মনে হল আমার সেই পরিচিত বীভার-পাড়ায় কটা দিন কাটিয়ে আসা যাক।

সাতদিনের রসদসমেত সাবেকি তাঁবু আর স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে একাই হাজির হলাম সেই প্রান্তরে। আমি জানতাম, বীভারদের আচরণ গৃহপালিত জীবের মতো নয়। হয়তো পেটুকের সন্ধানই পাব না, পেলেও আমি চিনতে পারব না, কারণ এই ছয় মাসে সে অনেক বড় হয়ে গেছে। পেটুকও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। তবু মনে একটু সন্দেহ ছিল। ঘটনাচক্রে পেটুক যদি আমার সামনাসামনি এসে পড়ে সে কি আমাকে চিনতে পারবে? প্রশ্নটা পেশ করেছিলাম অ্যালেক বুড়োর কাছে। আগেই বলেছি, অ্যালেক সারাজীবন বীভার শিকার করেছে। বীভারের আচার-আচরণ সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানে। আমি প্রশ্নটা পেশ করতেই হেসে উঠল অ্যালেক-বুড়ো। বলে, একটা অ্যালসেশিয়ান, ঘোড়া বা হাতি হয়তো ছ মাস পরেও তার 'মাস্টার'-এর গায়ের গন্ধ চিনে ফেলতে পারে, বীভার তা পারে না। প্রথমত, বীভার গৃহপালিত জন্তু নয়, ফলে বংশানুক্রমিকভাবে তারা 'মাস্টার'- এর গায়ের গন্ধ মনে রাখার চেষ্টা করেনি। সে শিক্ষাই ওরা কখনও পায়নি। দ্বিতীয়ত, ওদের ঘ্রাণশক্তি অত তীব্র নয়।

সুতরাং পেটুকের সন্ধান যে পাব না এটা জেনেই আমি এসেছি। তা হোক, দূর থেকে কোন জোয়ান বীভারকে দেখে মনে মনে সান্ত্বনা তো দিতে পারব—এতদিনে আমার পেটুক-সোনা অমন জোয়ান হয়ে উঠেছে।

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে গেল। কাল ভোরবেলা আমাকে শহরে ফিরে যেতে হবে। আজ সন্ধ্যায় আর রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। আগুন জ্বেলে নিশ্চুপ বসে আছি তাঁবুর ভিতর। এ কয়দিন অনেক-অনেক প্রাণী দেখেছি—কাঠবিড়ালী, খরগোশ, লিঙ্কস্, রাকুন এবং বীভার। শীতান্তে অনেক-অনেক পাখি ফিরে এসেছে হ্রদে। তাদের কলরব লেগেই আছে।



বাইরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আগুনে টিন্‌ড্ খাবার গরম করে আহার সমাধা করে বসে পাইপটা ধরিয়েছি, হঠাৎ কেমন যেন শব্দ হল তাঁবুর বাইরে। কিসের শব্দ? চোখ তুলে ওদিকে ফিরতেই দেখি তাঁবুর দরজার সামনে উবু হয়ে বসে আছে একটা বীভার! অবাক-চোখে সে দেখ্‌ছে আমাকে!

'পেটুক?'—না, ডাক নয়। একটা প্রশ্নবোধক শব্দ মাত্র। আমি নিজেকেই প্রশ্নটা করেছি।

বীভারটা নড়েচড়ে বসল। ভিতরে আসবে কিনা যেন ঠাওর করতে পারছে না। আমি নিঃশব্দে ঝুড়ি থেকে একটা পাকা কলা তুলে নিয়ে আমার সামনে রাখলাম। ওর নাগালের বাইরে। আমারও। বীভারটা একটু ইতস্তত করল।

*ও থাবাদুটি তুলে রাখল আমার তালুতে*

তারপর খুব সাবধানে এগিয়ে এল। আমার দিকে চোরা চাউনি হেনে। আমি স্ট্যাচু। তারপর সাহস সঞ্চয় করে খপ্ করে সে কলাটা তুলে নিল। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে টুম্‌টুম্ হয়ে বসল। সামনের দু-পায়ে কলাটাকে সাবটে ধরে খেতে শুরু করল। খায় আর তাকায়। অবশেষে শেষ হল তার আহার পর্ব।

দ্বিতীয় একটা কলা তুলে নিলাম আমি। এবার আর ছুঁড়ে দিলাম না। কলাটা তুলে ধরে বলি 'আয়, আয় না? ভয় কী! চিন্‌তে পারছিস্ না?'

কুৎকুতে চোখে আমাকে দেখছে।

হ্যাঁ, পেটুকই! নিঃসন্দেহে সে-ই! বীভারটা এগিয়ে এল। এবার আর ছোঁ মেরে কেড়ে নিল না। হাত থেকে ধীরেসুস্থে কলাটা নিয়ে ওখানেই বসে খেতে থাকে। পিছিয়ে দূরে সরে গেল না কিন্তু।

আমি খুব ধীরে ধীরে হাতটা বাড়িয়ে ওর মাথায় ছোঁয়ালাম। ও আপত্তি করল না। এবার ওর পিঠে হাত বুলাই। ওর দেহটা একটু কেঁপে উঠ্‌ল। ভয়ে নয়। গরুর পিঠে হাত দিলে যেমন তির্‌তির্ করে কাঁপে। সুড়সুড়ি লাগায় অথবা আরামে। কলাটা শেষ করে সে পূর্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে!

আমি এবার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। ও দুটি থাবা তুলে রাখল আমার তালুতে। ওও নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছে। কোন জঙলি বীভার এভাবে অচেনা মানুষের হাতে হাত তুলে দেবে না। এ নির্ঘাৎ পেটুক। আমি ওকে এবার কোলে তুলে নিলাম। আদর করলাম। সেই আগের মতো 'কাগের দলা, বগের দলা' খাওয়াতে শুরু করি তৃতীয় একটি কলা ছুলে নিয়ে। ভারি তৃপ্তি করে এবার সে খেল।

ঘণ্টা দুই সে ছিল আমার কাছে। তারপর আমি কম্বলটা টেনে নিয়ে বলি, 'আয় পেটুক, এবার শুয়ে পড়ি। সেই আগের মতো।'

এবার সে যেন ভারি লজ্জা পেল। রাজি হল না। গা চুলকালো, গোঁফ চুমড়ালো, আমার প্যান্টের পায়ার কাছে মাথাটা ঘষল। তারপর কী ভেবে সুট করে বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে। আমিও ছুটে বার হয়ে এলাম।

ততক্ষণে অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। টর্চটা তুলে নিয়ে জ্বাললাম।

এ কী! পেটুক তো একা আসেনি। অনেক দূরে জঙ্গলের আড়াল থেকে আর একটা মেয়ে-বীভার তার কুৎকুতে চোখ মেলে আমাকে দেখছে।

—অ্যাঁ, পেটুক! তুই বিয়ে করেছিস্! আমাকে না জানিয়ে?

পেটুক ভারি লজ্জা পেল! দুদ্দাড়িয়ে ছুটে গেল তার সঙ্গিনীর কাছে। পরমুহূর্তে ঝুপ্-ঝুপ্ করে একজোড়া বীভার ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হ্রদের জলে।



# পিতৃত্বের দায়

ছেলেবেলায় পড়তে হত, "গরু একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণী।"

চতুষ্পদ বুঝি—যার চারটে ঠ্যাঙ আছে ; স্তন্যপায়ীও বুঝি—যারা মিনি খায়; কিন্তু 'গৃহপালিত' ব্যাপারটা কী? যাকে গৃহে পালন করব সেই তো গৃহপালিত, না কি?

মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, না বাবা, সব জন্তু গৃহপালিত নয়। যারা মানুষের পোষ মানে, তারাই গৃহপালিত, যেমন গরু, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, মোষ। বাঘ, সিংহ, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি পোষ মানে না। প্রথম জাতের প্রাণীকে বলি 'গৃহপালিত', আর দ্বিতীয় জাতের প্রাণীরা হল 'বন্য'।

আমি বলি, তা কেন? সার্কাসে তো হামে-হাল দেখি বাঘ-সিংহ রিঙ্‌মাস্টারের পোষ মানে। বিল্‌খুড়োর একটা কাঠবিড়ালী আছে দিব্যি পোষ মেনেছে।

মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন, তোমার বড় তক্কো করা স্বভাব! তক্কো করো না, বুঝলে? বইতে লেখা আছে, মুখস্ত কর।

অতএব 'তক্কো' করিনি এবং 'মুখস্ত' করেছি।

তফাতটা সেদিন বুঝিনি! এখন বুঝতে পারি। কারণ তত্ত্বটা 'তক্কো' করে বুঝবার নয়—ওটা বুঝতে হয় অস্থিতে-অস্থিতে, অর্থাৎ হাড়ে-হাড়ে। ঐ যাদের মাস্টারমশাই ছেলেবেলায় আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন 'বন্য' বলে, ঘটনাচক্রে বড় হয়ে তাদের সঙ্গে ঘর-গেরস্থালি করতে হয়েছে। অদৃষ্টের ফের আর কি! অনেকে পোষ মেনেছে, অনেকে মানেনি—কিন্তু তাদের 'মানুষ' করতে হয়েছে। মানে, 'না-মানুষ' করতে হয়েছে। কারণ পেশা হিসাবে সেই বৃত্তিটাই বেছে নিয়েছিলাম—বন জঙ্গল ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বন্যপ্রাণী সংগ্রহ করে চিড়িয়াখানায় চালান দেওয়া। তাই অনেক সময় অতি শৈশবকাল থেকে কিছু বন্যজন্তুকে লালন-পালন করতে হয়েছে। অবশ্য সবটাই পেশা নয়, কিছুটা নেশাও বটে।

অর্থাৎ সখ করে।

পেশাই হোক, আর নেশাই হোক, নিতান্ত শিশুকাল থেকে একটি বন্যপ্রাণীকে বড় করে তোলা রীতিমতো বখেড়ার ব্যাপার। যন্ত্রণা বড় কম পাইনি। আনন্দও। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি জন্তু-জানোয়ারদের কেন এত ভালোবাসি? এককথায় ওর জবাব হয় না। এককথায় তোমরাও কি বুঝিয়ে বলতে পার—গান কেন ভালবাস, অথবা 'টিন্‌টিন' পড়তে কিংবা জমাটি বর্ষার রাতে ভূতের গল্প শুনতে? তবে এ কথাও বলব, ওদের লালন-পালন করতে গিয়ে শুধু আনন্দ নয়, শিক্ষাও পেয়েছি প্রচুর। ওরা সহজ, সরল, মনে-মুখে এক! মানুষের মধ্যে যে গুণটি দুর্লভ, যাকে সবচেয়ে সম্মান করি—দেশের জন্য, দশের জন্য স্বার্থত্যাগ বা প্রাণদান, ওরা তা হামেহাল করে থাকে। দলবদ্ধ জীব মাত্রেই এবং দলের সবাই! যূথবদ্ধ প্রাণীদের প্রত্যেক দলের জন্য লড়াইয়ে প্রাণ দিতে প্রস্তুত—হায়না, ডিঙ্গো, হাতি থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত। আবার মানুষের যেগুলো চরম দোষ—দশের প্রাপ্য আত্মসাৎ করা, হাসি-হাসি মুখে চোরা-গোপ্তা চালানো, তা না-মানুষেরা জানে না।

যে কথা বলছিলাম : পিতৃত্বের দায়।

কখনও কখনও আমাকে আট-দশ রকমের প্রাণীর 'বাপ' হতে হয়েছে! আমার সংগ্রহে মাঝে মাঝে দেড়-দুশো বিভিন্ন জাতের প্রাণী থাকে। স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, মাছ, পাখি, এমনকি কীটপতঙ্গ। তাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো যে কী ঝামেলার তা জানে সেই হিজিবিজের পরিচিত ভদ্রলোক, যে নাকি টিক্‌টিকি পুষতো! কে কোন্ খাদ্য কতটা খাবে, কার খাঁচা কী কায়দায় সাফা রাখতে হবে, পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে তাদের কী ভাবে বাঁচতে হবে, এসব শুধু জানলেই চলবে না—নজর রাখতে হবে যাতে সেগুলি ঠিক ঠিক পালিত হয়। ওরা যে আমার সন্তান। তোমাদের মধ্যে যাদের পোষা জীবজন্তু আছে—কুকুর, পাখি অথবা অ্যাকোরিয়ামের মাছ—তারা বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাই!

তার চেয়েও বড় কথা, তোমাকে দেখতে হবে জীবটা যাতে তার অভ্যস্ত পরিবেশে মনের স্ফূর্তিতে থাকে। যতই যত্ন নাও, ঐ প্রাণের স্ফূর্তিটা না থাকলে আরণ্যক প্রাণী বন্দীদশায় বেশিদিন বাঁচে না। এখানে আমি শুধু বাচ্চাদের কথা বলছি না, জোয়ান জীবন্তুর প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা। তাছাড়া যে কাজ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছি তাতে অনিবার্যভাবে কিছু সদ্যোজাত প্রাণীও এসে পড়ে



আমার হেপাজতে। যার মা হয়তো মারা গেছে, অথবা হারিয়ে গেছে। সেটাই সত্যিকারের 'পিতৃত্বের দায়'। সেই অভিজ্ঞতাই আজ তোমাদের কিছু শোনাবো। এ-ক্ষেত্রে শুধু খাবার আর যত্ন নিলেই তা যথেষ্ট নয়, তোমাকে ওর হারিয়ে যাওয়া বাপ-মায়ের ভূমিকাটা পুরোপুরি অভিনয় করতে হবে।

আমার প্রথম অভিজ্ঞতা চারটি 'হেজহগ' বাচ্চাকে নিয়ে। হেজহগ জন্তুটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে কি? অন্তত লুইস ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এ? ওর বাঙলা-নাম আমার জানা নেই। এদের বাস য়ুরোপে, এশিয়া এবং আফ্রিকায়। লম্বায় দশ-এগারো ইঞ্চি, মানে ত্রিশ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। সর্বাঙ্গে কাঁটা। সজারুর মতো বড় বড় কাঁটা নয়। পোকা-মাকড়, ফলমূল দুইই খায়। শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়, যাকে ইংরেজিতে বলে

*'পু-ঝিক্-ঝিক্' করে বার হয় বাসা ছেড়ে*

'হাইবারনেশান'। এরা নিশাচর। মা-হেজহগ যে কী কষ্ট স্বীকার করে তা টের পেয়েছিলাম চার-চারটি হেজহগকে না-মানুষ করতে গিয়ে। মা-হেজহগ সন্তানদের জন্ম দেয় মাটির নিচে গর্তের বাসায়। বাচ্চা পাড়ার আগে শুক্‌নো

ডালপালায় সাজিয়ে একটা নরম বিছানা পাতে। জন্মের পর বাচ্চাগুলো নিতান্ত অসহায়। তখন তাদের চোখ ফোটে না। আর তখন ওদের গায়ের কাঁটা—যা একটু বড় হলেই খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠবে—একটুও শক্ত নয়, তুলোর মতো নরম। কয়েক সপ্তাহ পরে কাঁটাগুলো শক্ত হতে থাকে। তিন-চার সপ্তাহ পার হলে ওদের মা বাসা ছেড়ে বাইরের দুনিয়া দেখাতে ওদের নিয়ে আসে, খাবার খুঁটে নিতে শেখায়। সে এক দৃশ্য। মায়ের লেজ কামড়ে ধরে প্রথম বাচ্চাটা; তারপর দ্বিতীয় বাচ্চাটা দাদার লেজ কামড়ে ধরে। এই ভাবে চার-পাঁচ ভাই একটি রেলগাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে 'পু-ঝিক্-ঝিক্' করে বার হয়ে আসে বাসা ছেড়ে।

আমি সেবার গ্রিসে। একদিন একজন স্থানীয় কৃষক আমাকে এনে দিল একটা হেজহগের খাঁচা। লাতাপাতায় বোনা। মা-হেজহগ বুঝি কি-করে মারা গেছে। চার-চারটে বাচ্চা তো তা জানে না। পড়ে আছে খাঁচায়! লোকটা মাটি খুঁড়তে গিয়ে খাঁচা-সমেত বাচ্চাদের দেখতে পায়। আমি যে জীবজন্তু ভালোবাসি সে-কথা সে জানত—তাই আমি ওদের হিল্লে করতে পারব ভেবে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। গোটা খাঁচাটা নামিয়ে রেখে লোকটা চলে গেল। খাঁচা মানে বাসা, যেটা ওদের মা বানিয়েছে লতাপাতা দিয়ে। একটা পাঁচনম্বরী ফুটবলের মতো আকার। তার ভিতর চার চারটে চুন্নু-মুন্নু হেজহগ বাচ্চা।

প্রথম কাজ হল ওদের খাওয়ানো। ওরা স্তন্যপায়ী। ফাউন্টেন পেনের কালি-ভরা ড্রপার ছিল, কিন্তু ওদের হাঁ-মুখ আরও ছোট। হঠাৎ মনে পড়ল আমার এক বন্ধুর বাচ্চা মেয়ের একটা ডল-পুতুল আছে, আর সেই ডল-পুতুলের জন্য ছিল ছো—ট্ট একটা ফিডিং বোতল। বন্ধুকে টেলিফোন করলাম। অনেক কায়দা করে ফিডিংবোতলটা বাচ্চাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে হাতানো গেল। অবশ্য ডল-পুতুল সে ফিডিং-বোতল থেকে দুধ খেতে পারে না, হেজহগ-বাচ্চা চুক্‌চুক্ খাবে এটা শুনে সে খুশি মনেই বোতলটা দিয়ে দিল। গরুর দুধে জল মিশিয়ে সেই ফিডিং-বোতল ওদের মুখের কাছে ধরতেই অমনি চুক্‌চুক্, চুক্‌চুক্! খুকুও খুশি, আমরাও। বরং খুকু আশ্বাস দিয়ে গেল যদ্দিন ইচ্ছে ওটা আমি রাখতে পারি।

প্রথমে বাচ্চাগুলোকে খাঁচাসমেত একটা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে রাখতাম। কিন্তু তিনদিন না যেতেই সেটা এমন নোংরা হয়ে গেল যে, আমাকে দৈনিক



পাঁচ-সাতবার পাতা বদলে সাফা করতে হয়। অবাক হয়ে ভাবতাম, মা-হেজহগ কি দিনে অতবার নোংরা পাতা বদলে নতুন পাতা পেতে বাসাটাকে সাফা রাখতো? তাহলে বাচ্চাদের জন্য সে খাবার সংগ্রহ করবার সময় পেত কী করে? চোপর-দিন ওদের হাঁ-হাঁ করা খিদে। প্যাকিং বাক্সটা ছুঁয়েছি-কি ছুঁইনি, চার-চারটে ক্ষুদে রাক্ষস চিল-চ্যাঁচান চিল্লানি শুরু করে। চার-চারটে নাক বেরিয়ে আসে আর আঁতিপাঁতি খুঁজতে থাকে বোতলের মুখটা। একটাকে খাওয়ানো শেষ করে যে দ্বিতীয়টাকে খাওয়াবো তার তর সয় না। ক্রমাগত গুঁতোগুঁতি।

বেশির ভাগ জীবজন্তুর বাচ্চাই জানে কতটা খাদ্য তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আমার অভিজ্ঞতা বলে, হেজহগ একমাত্র ব্যতিক্রম! জাহাজডুবির পর হতভাগ্য নাবিকেরা যেমন ভেসে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ি মরণপণ আঁকড়ে থাকে, তেমনিভাবে ওরা কামড়ে ধরে থাকত বোতলটা দুধ ফুরিয়ে যাবার পরেও। যেন কত বছর ওরা খেতে পায়নি। খেতে খেতে এমন অবস্থা হত যেন পেট ফেটে মরে যাবে। বইপত্র ঘেঁটে দেখি, জীব-বিজ্ঞানের বইতেও তাই লিখেছে। হেজহগের রাক্ষুসে খিদের কথা। হেজহগের বাচ্চারা নাকি সচরাচর মারা যায় পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়েই। এ-জন্য মা হেজহগ খুব সতর্ক থাকে। পরিমাণের বেশি ওদের খেতে দেয় না। বইয়ের একটি তালিকায় লেখা ছিল কত সপ্তাহের বাচ্চাকে কতটা খেতে দেওয়া উচিত। আমি সেই হিসাবমতো ওদের খাওয়াতে থাকি। কয়েক সপ্তাহের ভিতরেই ওরা চারজন বেশ লায়েক হয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল, পরের সপ্তাহে খাঁচা থেকে বার করে ওদের বাগানে নিয়ে যাব ; পোকা-মাকড় ধরে খাওয়া শেখাবো। সে ইচ্ছাটা, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার পূর্ণ হয়নি।

ঐ সময় একদিনের জন্য আমাকে একটু বাইরে যেতে হল। এক রাত্রি আমাকে বাইরে থাকতে হবে। চার-চারটে কাঁটা-ওয়ালা ছানা-পোনা নিয়ে সেখানে যাওয়া চলে না। একদিন না খেলে অবশ্য ওরা মারা যাবে না—কিন্তু কী দরকার? আমার এক ছোট বোন থাকত কাছেই। তার বাড়িতে বাচ্চাগুলোকে এক দিনের দিনের জন্য রেখে গেলাম। তাকে পৈ-পৈ করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম, কতটা দুধ ওরা ক-বারে খাবে।

কাজ সেরে পরদিন ফেরার পথে বাচ্চাগুলোকে বোনের বাড়ি থেকে নিয়ে

আসতে গেলাম। কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলে দিয়েই আমার বোন আমাকে প্রচণ্ড ধমক লাগালো, আচ্ছা দাদা! তুই কী নিষ্ঠুর! বাচ্চাগুলোকে ভরপেট খেতে দিস্ না? তুই যেটুকু দুধ বরাদ্দ করে গিয়েছিলি তাতে ওদের পেটই ভরেনি।

আমি আঁৎকে উঠি, তার মানে? তুই কি আরও দুধ খাইয়েছিস্?

—নিশ্চয়! আমি তো তোর মত হাড়কিপ্‌টে নই! দ্যাখ এসে, কী আরাম করে ভরপেটে ঘুমোচ্ছে ওরা।

ছুটে গেলাম খাঁচাটার কাছে। ভরা পেটেই বটে! চার-চারটে ক্ষুদে ফুটবল! এত খেয়েছে যে, সোজা হয়ে চার-পায়ে দাঁড়াতে পারছে না। মানে, ওদের পেট এত নেমে এসেছে যে হাত-পাগুলো মাটি ছুঁতে পারছে না!

যেটুকু করা সম্ভব করেছিলাম। কিছু কিছুতেই কিছু হল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারটেই মারা গেল। 'অ্যাকিউট এন্টেরাইটিস' রোগে। সবচেয়ে মর্মাহত হল আমার ছোট বোন। কিন্তু এখন ক্ষমা-চাওয়া বা ক্ষমা-করা দুটোই সমান নিরর্থক।

আমার প্রথম পিতৃত্বের দায় আমি যথাযথ পালন করতে পারিনি।

দু-নম্বর সন্তানটিও বাঁচেনি।

মা-হেজহগের মতো সব জীবই যে বাচ্চাদের যত্ন নেয়, এ-কথা বলা চলে না। কেউ কেউ বেশ উদাসীন। যেমন ধর ক্যাঙারু।

ক্যাঙারুর পেটে থলি থাকে। বাচ্চাগুলো ইতিউতি ঘুরে বেড়ায়। আর ভয় পেলেই ছুটে এসে মায়ের পেটের থলিতে আশ্রয় নেয়—এসব কথা তোমরা জানো। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিম যখন কলকাতায় খেলতে আসে তখন ঐ জাতের ছবি খবরের কাগজে, বা বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়—তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। মায়ের পেটের থলি থেকে বাচ্চা ক্যাঙারু পুটপুট করে তাকাচ্ছে—এমন ছবি হামেহাল তখন দেখা যায়। কিন্তু এ খবর কি রাখ যে, ক্যাঙারুর সদ্যোজাত বাচ্চা একটা চায়ের চামচে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? প্রমাণ-সাইজ একটা ক্যাঙারু ফুট পাঁচেক লম্বা, মানে প্রায় দেড়মিটার। আর সদ্যোজাত একটি ক্যাঙারুর দৈর্ঘ্য প্রায় আধ ইঞ্চি, মানে এক সেন্টিমিটার! আসলে মায়ের পেট থেকে যা জন্ম নেয় তা পুরোপুরি বাচ্চা নয় ; আধা-বাচ্চা, আধা-ভ্রূণ। চোখ ফোটে



অনেক দিন পরে। মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে ঐ আধা-ভ্রূণ বাচ্চাটা নিজের চেষ্টায় মায়ের পেট পর্যন্ত উঠে আসে। মা তাকে দেখতেই পায় না, তার সাহায্য করবে কি? মায়ের তলপেটের লোম ঐ শিশুর চেয়ে লম্বায় বড়। কী-ভাবে ঐ অন্ধ জীবটা লোম-আঁকড়ে হাতড়ে-হাতড়ে মায়ের স্তনের সন্ধানে উপরে উঠে আসে ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। পথের দৈর্ঘ্যটা ওর দেহের তুলনায় ষাট-সত্তর গুণ! তুলনা করে ভাবতে পার একটা এক ফুট লম্বা সদ্যোজাত মানব শিশু পাঁচ-ছয় তলা বাড়ির ছাদে উঠছে? সিঁড়ি বা লিফ্‌ট দিয়ে নয়, ডাউন পাইপ বেয়ে, যাতে ঐ ছয় তলা বাড়ির ওভারহেড ট্যাঙ্কের কাছে মায়ের মিনির সন্ধান পাবে?

অমন ক্যাঙারু-বাচ্চাকে 'না-মানুষ' করার সৌভাগ্য অবশ্য আমার হয়নি। তবে একবার একটা ওয়ালাবি শিশুর দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছিল। 'ওয়ালাবি' জন্তুটা, ক্যাঙারুর মতো, শুধু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই পাওয়া যায়। দেখতে প্রায় ক্যাঙারুর মতো ; মাপে একটু ছোট হয়। কলকাতার চিড়িয়াখানায় ক্যাঙারু আর ওয়ালাবি দুটোই আছে—প্রায় পাশাপাশি খাঁচায়। এবার যখন চিড়িয়াখানায় যাবে ওদের পার্থক্যটা নজর কর। অমনই একটা ওয়ালাবি-বাচ্চা আমার হেপাজতে এসে পড়ল নিতান্ত ঘটনাচক্রে।

আমি সে-সময় হুইপস্‌নেড জু-তে জন্তু-জানোয়ারদের দেখ্‌ভাল করার কাজ করি। সেখানে অনেকগুলি ওয়ালাবি ছিল। এরা নিরীহ প্রাণী, তাই কর্তৃপক্ষ এদের খাঁচায় বন্দী করেননি। বাগানে ছাড়া থাকতো। কয়েকটা দুষ্টু ছেলে একদিন সবার অলক্ষিতে ঐ ওয়ালাবিগুলোকে তাড়া করে। তারা অবশ্য ওদের কোনও ক্ষতি করতে চায়নি—ছুটোছুটি খেলতে চেয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ওদের মধ্যে ছিল একটি সদ্যজননী। তাড়া খেয়ে পালাবার সময় ঝাঁকুনিতে বাচ্চাটা মায়ের পেট থেকে ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে যায়। ছেলেগুলো তা দেখতে পায়নি। অনেক পরে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল। পথের ধারে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। বিঘৎখানেক লম্বা, তখনও কিন্তু চোখ ফোটেনি। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম বাচ্চাটাকে। তার মা যে কোন একজন কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারিনি। আগেই বলেছি, কোন কোন জীবের মায়েরা উদাসীন। বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি ওয়ালাবি-পাড়ায় বৃথাই ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করলাম।

বাধ্য হয়ে ওভারকোটের পকেটে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

আমার ল্যান্ডলেডির প্রবল আপত্তি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে রাজি করানো গেল। বাচ্চাটাকে আমি বিছানায় নিয়ে শুতাম। কারণ তখন ওখানে বেশ শীত। বাচ্চাটা তার মায়ের পেটের উত্তাপ চাইবে এটাই স্বাভাবিক। গরম ফ্লানেলে জড়িয়ে নিয়ে শুতে চাইলাম—তাতে ওর ঘোর আপত্তি। ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়ে ফ্লানেলটা সরিয়ে ও তেড়েফুঁড়ে বাইরে আসতে চায়! কম্বলের তলায় চাপা দিলেও তার প্রবল আপত্তি। এ তো মহা মুশ্‌কিল। শেষমেশ আমার শার্টের ভিতর ওকে ঢুকিয়ে নিলাম। এবার ও বেশ শান্তি পেল। ও বোধহয় জীবদেহের উত্তাপই খুঁজছিল। সেটাই স্বাভাবিক। একে বলে 'জন্মগত সংস্কার'—বইতে পড়েছি। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যেভাবে একটা শিশুজীব অভ্যস্ত—জন্মের পরে সে ঠিক তাই চায়। যদি ভগবান মানো তাহলে এটা তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু বিজ্ঞানের কারবারে ভগবানের দোহাই পাড়া চলে না। তাই বিজ্ঞান একে বলে 'জন্মগত সংস্কার'। কেমন জানো? যেমন ধর মানুষের বাচ্চা। জন্মের পরে মা যখন তাকে বুকে টেনে নেয়, অমনি সে চুক্‌-চুক্‌ করে মায়ের মিনি খেতে থাকে! কে তাকে শেখালো? তার আগেও শ্বাস নিতে কে তাকে পরামর্শ দিল? একজাতের বাঁদর আছে যারা গাছের উপর জন্মায়। হিংস্র জন্তুর ভয়ে মা মাটিতে নেমে বাচ্চার জন্ম দেয় না। জীববিজ্ঞানীরা দেখেছেন—সেই জাতের বাঁদর মায়ের পেট থেকে ভালো করে বের হবার আগেই একটা হাত বাড়িয়ে গাছের একটা ডাল শক্ত করে ধরে নেয়। মায়ের পেটে থাকতেই সে মাধ্যাকর্ষণ-এর প্রভাব—অর্থাৎ জন্মমাত্র সে যে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে মরে যাবে, এটা সে কেমন করে জানল? ঐ একই জবাব : 'জন্মগত সংস্কার'! বংশ পরম্পরায়—আত্মরক্ষার এ তাগিদ ঐ ভ্রূণের ছোট্ট মস্তিষ্কের এক কোনায় ঠাঁই নেয়। আমার বাচ্চা—মানে ঐ ওয়ালাবি-শিশু—তেমনি তার বাপ-পিতেমোর আমল থেকে শিশুকালে মায়ের দেহের উত্তাপটাই আশা করতে শিখেছে। ফ্লানেল অথবা কম্বল তাই ওর পছন্দ নয়।

কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়? পাঁচ-মিনিট পর পরই সে পিছনের পা দিয়ে আমার পেটে গোঁত্তা মারে! নখও আছে। জামাটা ছিঁড়ে গেল, চামড়াও গেল ছড়ে। প্রথম রাতটা বাপ-বেটা কারও ঘুম হল না। মাঝরাতে বাধ্য হয়ে আবার আমি কৌশলটা বদল করি। জামার ভিতর থেকে বার করে এনে লেপচাপা দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করি। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমিও এবার



নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাই। কিন্তু শেষ রাতে সে জোড়া পায়ের এমন লাথি ঝাড়লো যে, নিউটনের সেই তিন-নম্বর সূত্র অনুসারে নিজেই ছিট্‌কে পড়ল খাট থেকে। পড়েই নির্জীব হয়ে গেল। বাইরে তার কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোধ হয় দেহের ভিতর ইন্টার্নাল হেমারেজ হচ্ছিল, কারণ নাক-মুখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। রাত পোহাবার আগেই বাচ্চাটা মারা গেল।

পর পর দু-দুটো সন্তান মারা যাবার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করেছি। প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীতে—কী যে দুর্মতি হল—আমি আমার স্ত্রীকে একটা অদ্ভুত জীব উপহার দিলাম। আমার স্ত্রী আমারই মতো জীব-জন্তু ভালোবাসে। এই ছোট জীবটিকে আমি বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম। একটা উড়ন্ত কাঠবেড়ালী। আজীব জীব! উত্তর আমেরিকায় ওদের বাস। বুকের দিকটা ধব্‌ধবে সাদা, পিঠে একটা সব্‌জে পশমের কোট। উড়তে পারে বললে অতিশয়োক্তি হবে, আবার শুধু লাফ দিতে পারে বললে তার কৃতিত্বটা ছোট করে দেখানো হয়। এ-গাছ থেকে ও-গাছে যখন ঝাঁপ দেয় তখন বাদুড়ের মতো হাত-পা নাড়তে থাকে—বাদুড়ের মতো হাত আর পায়ের মধ্যে একটা চামড়ার জোড়াতালি আছে বলে গ্লাইডারের মতো পাঁচ-সাত হাত দিব্যি উড়ে যায়—হ্যাঁ, উড়েই যায়। আমি যে উড়ন্ত কাঠবিড়ালী বা ফ্লাইং

*'কাটুম-কুটুম'*

স্কুইরেল-এর বাচ্চাটাকে নিয়ে এলাম সে বেচারি ঘরের ভিতর উড়বার যথেষ্ট অবকাশ পায়নি। প্রথমে একটা কাঠের খাঁচায় বন্দী করে তাকে আমাদের শোবার ঘরেই রাখা হল। আমরা তার দিলাম : কাটুম্‌-কুটুম। দু-চারদিনের ভিতরেই সে আমাদের দিব্যি পোষ মানল। তখন শীতকাল, ও অবশ্য প্রচণ্ড শীতে অভ্যস্ত—কিন্তু আমরা তো তা নই। তাই ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে

ওকে ঘরের ভিতরে ছেড়ে দিতাম। খাঁচার দরজাটা খোলা থাকত, যাতে ইচ্ছা মতো সেখানে গিয়ে ও আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু কাটুম্-কুটুম্ হচ্ছে নিশাচর প্রাণী। রাতে সে একটুও ঘুমোতো না—সারারাত কুটুর কুটুর লেগেই আছে। তারপর দেখা গেল—ঐ খাঁচাটা তার একদম পছন্দ হয়নি। সে গিয়ে আশ্রয় নিল আমাদের কাঠের আলমারিটার পিছনে। দেয়াল থেকে আলমারিটা আধ বিঘৎ সামনে রাখা ; সেই ফাঁকে কাঠ-কুটো গুঁজে ও নিজেই একটা বাসা বানালো। সেখানেই সে থাকে। তামাম রাত ঐ কুটুর-কুটুর খচর-মচর আমার ভালো লাগে না। ওকে বৈঠকখানায় পাচার করতে চাইলাম। ও কিন্তু সেটা মেনে নিল না। ঐ আলমারির পিছনের ফাঁকটাই তার চাই! উপায় কী? ওটাকেই যে ওর বাসা বলে ধরে নিয়েছে। আর রাতে বিরক্ত করা? কিন্তু সেটাও যে ওর ধর্ম! সারা দিন ঘুমোবে আর সারা রাত জাগবে। মাস-দুত্তিন পরে সেটা বেশ বড় হয়ে গেল ; খুব পোষও মানল। আমাদের খাটের উপর বসে বিস্কুট, টোস্ট খেত কুট্ কুট্ করে।

তাঁর কীর্তি-কাহিনী বোঝা গেল নববর্ষের আগের দিন। নববর্ষের আমাদের দুজনের একটা জবর নিমন্ত্রণ ছিল। আমার স্ত্রী কাঠের আলমারিটা খুলেই চমকে উঠ্লেন। বললে, দেখ, এসে দেখ তোমার কাটুম-কুটুমের কাণ্ড!

ঐ কাঠের আলমারিতে রাখা ছিল আমার গরম সুট, জামা-প্যান্ট। গিন্নি সতর্ক মানুষ। নিজের ভালো ভালো পোশাক তিনি সাজিয়ে রেখেছেন লোহার আলমারিতে। কাঠের ওয়াড্রোবটা খুলে দেখা গেল কাটুম-কুটুম তার পিছন দিকের তক্তায় ছ্যাঁদা করে ভিতরে যাবার ব্যবস্থা করেছে। ওর বাসাটা আলমারির পিছনে নয়, আলমারির ভিতর। আর লতা-পাতা কিছুই তাকে আহরণ করতে হয়নি ; ফ্লানেল-উল-টেরেলিন দিয়ে তার বাসা তৈরি। উপাদান সংগৃহীত হয়েছে আমারই সুট-প্যান্ট-শার্ট-টাই থেকে! আলমারির ভিতর একটি কোনায় তার ভাঁড়ার ঘরও আছে। সেখানে থরে থরে সাজানো—আপেলের টুক্রো, খেজুরের বীচি, বিস্কুট বা টোস্টের ভুক্তাবশেষ, নুড়ি-পাথর, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে-কটা পোশাক দাঁত দিয়ে তখনও কাটা হয়নি তার উপর মডার্ন-আর্ট-এর রসঘন চিত্তির-বিচিত্তির!

বলা বাহুল্য সাদামাঠা পোশাক পরেই নববর্ষের পার্টির বখেড়া মেটাতে হল।

পরদিন কাটুম-কুটুমকে নববর্ষের প্রেজেন্ট হিসাবে উপহার দিলাম



চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষকে। আমার বদান্যতায় চিড়িয়াখানার ডাইরেক্টার বেজায় খুশি।

পরের বছর বিবাহ-বার্ষিকীর আগে গিন্নি বললেন, একটা ভোঁদড় বাচ্চা পুষলে কেমন হয়? আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পালটে দিলাম।

তৃতীয় বিবাহ-বার্ষিকীতে অবশ্য গিন্নি ওসব প্রসঙ্গ আদৌ তুলবার অবকাশ পাননি। একটি সদ্যোজাত মানুষের বাচ্চাকে নিয়ে তখন তিনি বিব্রত।

* * *

কেউ দেখে শেখে কেউ ঠেকে। আবার কেউ-কেউ জন্ম নবকুমার! দেখে-ঠেকে কিছুতেই শেখে না। আজীবন 'কাষ্ঠআহরণ' করে চলে! আমারও হয়েছে সেই বৃত্তান্ত! কাটুম-কুটুমের পর যাঁর জ্বালায় জ্বলেছি তিনি হচ্ছেন : 'কুসিমান্সি'!

জীবটির সঙ্গে আমার চেনা-জানা ছিল না। পশ্চিম-আফ্রিকাতে জীবজন্তু সংগ্রহ করতে যাব। বিভিন্ন চিড়িয়াখানার কর্তাব্যক্তিরা সে সময় চিঠি লিখে জানাচ্ছেন কার কী চাই। গাঁয়ের ছেলে শহরে যাবার আগে বাড়ির সবাই যেমন নানান ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠাকুর্দা বলে, দা-কাটা তামাক পাওয়া যায় কি না দেখিস তো। ঠাম্মা বলেন, আর কাশীর জর্দা। বৌদি তালিকার তলায় লিখে দেন : এক শিশি ন্যাচারাল শ্যাম্পু ; আর খোকন বলে, খোঁজ নিয়ে দেখো তো কলকাতায় নতুন 'টিনটিন' এসেছে কি না।

লন্ডন-জুর বড়কর্তা আমাকে যে তালিকাটি পাঠিয়েছেন তাতে লেখা আছে ঐ নামটা। শোনা গেল 'রোডেন্ট-হাউসে' একটি মাত্র মদ্দা 'কুসিমান্সি' টিকে আছে, সে বড় মনমরা হয়ে থাকে ; তাই তার জন্যে একটা মেয়ে কুসিমান্সি চাই। চাই তো বুঝলাম, কিন্তু তিনি ব্যক্তিটি দেখতে কেমন? কোথায় নিবাস? জীববিজ্ঞানের বইতে বলেছে, পশ্চিম-আফ্রিকাতেই ওদের পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছি তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়টা আগে দরকার। তাই একদিন লন্ডন-জুতে যেতে হল চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে।

লন্ডন-জুর 'রোডেন্ট হাউসে' খুঁজতে খুঁজতে দেখি একটি খাঁচার সামনে কাঠের ফলকে লেখা আছে : KUSIMANSE ; কিন্তু খাঁচাটা খালি। তাহলে কি ইতিমধ্যে মারা গেছে? ফলকটায় ওর জীব বিজ্ঞানসম্মত ল্যাটিন নামটাও লেখা আছে : *Crossarchus obscurus.*

*　　*　　*

কিন্তু ল্যাটিন নাম জেনে আমার কী ফয়দা? জন্তুটার চেহারা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ সম্বন্ধে আমার ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। কোথায় থাকে—গাছের ফোকরে, না মাটির তলায় গর্তে? কী খায়? ধরা পড়লে তাকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো! হঠাৎ নজর হল—খাঁচার মাঝামাঝি একটা খড়ের গাদা। খাঁচাটা যদিও ফাঁকা, ঐ খড়ের গাদাটা কামারের হাপরের মতো উঠছে-নামছে। ব্যাপার কী? কান পেতে শুনি, একটা ক্ষীণ নাক-ডাকার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে : ফুতুর-ফুতুর! বুঝতে পারি খাঁচাটা খালি নয়, ঐ খড়ের গাদার নিচে শ্রীমান কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।

প্রতিটি চিড়িয়াখানাতে নির্দেশ দেওয়া থাকে—ঘুমন্ত প্রাণীকে জাগানো মানা। এ নিয়ম আমিও খুব কঠোরভাবে মেনে থাকি। কিন্তু আজ আমি উপায়ন্তরবিহীন। গরজ বড় বালাই। এতটা পথ এসেছি শুধু ওঁকে দেখব বলে। চিড়িয়াখানা দেখতে নয়।

পকেটে থেকে গাড়ির চাবিটা নিয়ে তারের জালতিতে টুক্-টুক্ শব্দ করি। একটু পরেই ওঁর ঘুম ভাঙলো। খড়ের গাদাটা নড়ে-চড়ে উঠল। তার ভিতর থেকে বের হয়ে এল একটা সূচালো নাক। ধেড়ে ইঁদুরের মাপের। তার পিছন পিছন একজোড়া ঘুমে ঢুলঢুলু লাল চোখ : এতরাত্তিরে কে রে!

ও আমাকে দেখল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে একটা সুগার-কিউব বার করে জালতির ফাঁক দিয়ে ধরে আছি। দেখা যাক কী করে।

সেটা নজরে পড়তেই ওর কণ্ঠ ভেদ করে যে শব্দটা বার হল তা মুষিক-সুলভ। বঙ্গানুবাদে যার অর্থ : তাই বল! তাই ডাকছিলে বুঝি?

তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ এবং এক লম্ফে আমার সন্নিকটে। অনেকটা বেজির মতো দেখতে, মাপেও তাই, তবে মুখটা অনেক বেশি সূচালো। আর এক ঝাঁক গোঁফ আছে সেই মুখে। ওর চট্‌পটে ভাব আমাকে আকৃষ্ট করল। ভয়-ডর বিশেষ আছে বলে মনে হল না। দিব্যি আমার হাত থেকে একের পর-এক অনেকগুলি সুগার কিউব খেল। আমার ভাঁড়ার শেষ হয়েছে এটা কিছুতেই মানতে চায় না। অনেক কুঁই কুঁই করার পরেও যখন লবডঙ্কা ছাড়া আমার হাতে কিছুই দেখতে পেল না তখন একটা 'ফোঁৎ' করল। এবার বঙ্গানুবাদে সেটা—'দুত্তোর, নিকুচি করেছে।'



একছুটে ফিরে গেল খড়ের গাদায়। পুটস করে ঢুকে গেল ভিতরে। বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, দশ সেকেন্ডের ভিতরেই খড়ের গাদাটা কামারের হাপরে পরিণত হল। বোঝা গেল, 'নিদ্রাটি আছে সাধা'!

'প্রথম দর্শনে প্রেম' বলতে যা বোঝায় আমার তাই হয়েছে। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কুসিমান্সি জীবটিকে ভালবেসে ফেলেছি। স্থির করলাম—যেমন করে হোক, পশ্চিম-আফ্রিকায় পৌঁছে আমাকে ধরতে হবে—না, একটা নয়, একজোড়া কুসিমান্সি। মেয়েটি দেব লন্ডন জুকে, ছেলেটাকে রাখব নিজের কাছে।

মাসখানেক পরের কথা। আমি তখন ক্যামারুনের গভীর অরণ্যে। ক্যামারুন হচ্ছে আফ্রিকায়। নাইজিরিয়ার দক্ষিণে। লিস্ট মিলিয়ে অধিকাংশ জীব-জন্তুই আমার বন্দীশালায় না-মানুষ হচ্ছে। তাদের দেখ্‌ভালের কাজে আমার স্ত্রী এবং দুজন স্থানীয় খিদ্‌মদ্‌গার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর আমি বনবাদাড় ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছি বাকি কয়টি নিমন্ত্রিতের সন্ধানে। তালিকায় যে কটি প্রাণীর পাশে ঢেরা চিহ্ন পড়েছে তার মধ্যে আছে শ্রীমান কুসিমান্সি। তার দেখা যে পাইনি তা না, কিন্তু ভারি শেয়ানা। ধরতে গেলেই ফুড়ুৎ!

প্রথম যেটার দেখা পেয়েছিলাম সেটা একটা নদীর ধারে। বহু দূর থেকে বাইনোকুলারে তার কাঁকড়া ধরার কায়দা লক্ষ্য করেছিলাম। রাকুন যেমন জলের মধ্যে থাপন জুড়ে বসে হাত ডুবিয়ে আতি-পাঁতি খুঁজতে থাকে, এর কায়দা সে রকম নয়। কুসিমান্সি জলে নেমে পড়ে—অল্প জলে, যেখানে তার ডুব-জল নয়। নাকটা জেগে থাকে জলের উপর—অনেকটা সাব্‌মেরিনের চোঙের মতো—শ্বাস নিতে। নিচের ঠ্যাঙজোড়া হাঁটার জন্য, আর হাতদুটোর ব্যবহার শিকার ধরতে। কাঁকড়ার সন্ধান পেলেই জল থেকে টেনে তোলে ; ডীপ-থার্ড-ম্যান যখন দেখে ব্যাটস্‌ম্যান তৃতীয় রান নিতে দৌড়াচ্ছে তখন যে ভঙ্গিতে বলটা পিক্-আপ করেই ছোঁড়ে অবিকল সেই ভঙ্গিতে কাঁকড়াটাকে ছুঁড়ে ফেলে ডাঙায়। খব্‌ল খব্‌ল করতে করতে এবার নিজে উঠে আসে। কাঁকড়াটা ছুটে জলের 'ক্রীজে' পৌঁছবার আগেই—'হাউস দ্যাট্'। বসায় মোক্ষম এক কামড়! দু-একবার ব্যাঙও ধরল! কিন্তু জুত হল না। ব্যাঙটাকেও সে একই কায়দায় ছুঁড়ে দিচ্ছিল ডাঙার দিকে, কিন্তু ব্যাঙ বাবাজি ওর চেয়েও খলিফা। ডাঙায় তার শত্রু পৌঁছবার আগেই সে আবার এক লাফ মারে জলের

দিকে : ত্রিং!

ঘটনাটা বারতিনেক ঘটল। আমি আজও ভেবে পাই না ঐ মূর্খসম্রাট ব্যাঙটাকে ডাঙার দিকে ছুঁড়ে ফেলার আগে কেন যে একটা মোক্ষম কামড় দিচ্ছিল না। কাঁকড়ার বেলায় তার অর্থ বোঝা যায়—কাঁকড়া শুধু ডিফেন্সে খেলে না, অফেন্সও চেনে। সে দাঁড়া উঁচিয়ে থাকে! ফলে জলের চেয়ে ডাঙাতেই তার সঙ্গে মোকাবিলা করা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ব্যাঙ? এই সহজ ব্যাপারটা ঐ মোটা মাথার বুদ্ধিতে এল না। বারবার তিনবারই দেখলাম—ওভার বাউন্ডারি! কুসিমাম্পির মাথার ওপর দিয়ে ব্যাঙ-বাবাজী ত্রিং করে লাফ দিয়ে পড়ল জলে। যেন বাউন্ডারি-ঘেঁষা ডীপ স্কোয়্যার লেগ ফ্যাল ফ্যাল করে

ওভার বাউন্ডারি!!
কুসিমাসির মাথার ওপর দিয়ে



দেখছে আকাশপথে চলেছে একটা ছক্কার মার।

আক্রমণাত্মক খেলায় যে এমন অপটু, রক্ষণাত্মক খেলায় সে কিন্তু অতি ওস্তাদ। ত্রিসীমানায় পৌঁছবার আগেই ও ঠিক বুঝতে পারে কোথা দিয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমার পায়ের শব্দই পায়, না গায়ের গন্ধ কী-জানি। তৎক্ষণাৎ সুট-সাট। মুহূর্তে জঙ্গল একেবারে সুন্‌সান।

অনেক ফন্দি-ফিকির করেও কোনও কুসিমাম্পিকে পাকড়াও করতে পারিনি। তারপর একদিন নিতান্ত ঘটনাচক্রে তিন-তিনটে কুসিমাম্পি আমার তাঁবুতে এসে আশ্রয় নিল।

ওদের নিয়ে এল একজন আদিবাসী। জঙ্গলে সে উদ্ধার করেছে তালপাতায় বোনা একটা বাসা, তাতে তিনটে সদ্যোজাত কুসিমাম্পি। প্রথমটা আমি চিনতে পারিনি। সদ্যোজাত বেড়ালছানার চেয়েও ছোট। হঠাৎ ওদের মধ্যে একটা বাচ্চা সূচালো নাকটা উঁচু করে আমার দিকে তাকালো। তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলি! সেই ছুঁচো-ছুঁচো মুখ, সেই খোঁচা-খোঁচা গোঁফ! যেন ও বলছে—কী স্যার? চিনতে পারলেন না? আমার ছোড়দাদুর ভাইরাভাইয়ের বোনপোকেই না সুগার কিউব খাইয়েছেন লন্ডন-জুতে?

সবে চোখ ফুটেছে ; কিন্তু দাঁত গজায়নি। ফাউন্টেন পেন-এ কালি ভরার ড্রপার ছিল। কিন্তু এবারও সেটা মাপে বড় হল। ওদের হাঁ-মুখ আরও ছোট। এ জঙ্গলে বন্ধুতনয়ার ডল পুতুলের ফিডিং বোতল আমি কোথায় পাব? একমাত্র সমাধান পলতে করে দুধ খাওয়ানো। দেশলাই কাঠির মাথায় তুলো জড়িয়ে নিলাম। ঈষদুষ্ণ দুধে মিশিয়ে করে খাওয়াতে থাকি। সব বাচ্চাই এদিক থেকে এক রকম। প্রথমে প্রবল আপত্তি,—মাথা ঘুরিয়ে নেবে, লাফ মেরে তেড়ে-ফুঁড়ে উঠবে, চিল-চ্যাঁচান চিল্লাবে। তারপর যেই দুধের স্বাদ জিভে লাগবে অমনি তার ভোল পাল্টে যাবে। এবার কিন্তু বিপদ হল অন্য জাতের। এত জোরে চুষছে যে, দেশলাই-কাঠির আলিঙ্গন অস্বীকার করে তুলোটা ওদের পেটে চলে যেতে চায়।

প্রথম ওদের আশ্রয় দেওয়া হল একটা বেতের ঝুড়িতে। বেশ শক্ত-পোক্ত। রাখতাম আমার ক্যাম্পখাটের পায়ের কাছে! কারণ মাঝরাতেও উঠে দু-তিনবার ওদের খাওয়াতে হত। প্রথম সপ্তাহ-দুয়েক ওরা বেশ লক্ষ্মী হয়ে ছিল। আহার আর নিদ্রা। কোনও দুষ্টুমি নেই। কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহে যেই সামনের

দাঁত বের হল অমনি ওদের ভোল গেল পাল্টে। কুটুর-কুটুর করে তিন ভাইয়ে মিলে বেতের ঝুড়িটা কাটতে শুরু করল। এখন ওদের মাঝে মাঝে আলো-হাওয়ায় বের করে আনা দরকার। সকালবেলায় খাটে শুয়েই বেড-টি পান করা আমার একটা বিলাস। সেদিন সকালে বাচ্চা তিনটেকে বার করে আনলাম হাত বাড়িয়ে। দুটোকে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে তিন নম্বরটাকে হাতে তুলে নিই। দেখা যাক, প্লেট থেকে চুক্-চুক্ করে খেতে পারে কি না। বাচ্চাটার সূচালো নাক প্লেটে ছুঁইয়েছি কি ছোঁয়াইনি ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। দায়ী আর কেউ নয়, আমারই দক্ষিণ চরণ! গরম চায়ের পোয়ালাটা উল্টে পড়ল আমারই গায়ে। ঠ্যাঙের দোষে হাত পুড়ল। ঠ্যাঙকেই বা দোষ দেব কী। ইতিমধ্যে দু-নম্বর কুসিমাঙ্গি কম্বলের তলা দিয়ে চলে গিয়েছে আমার পায়ের দিকে। বুড়ো-আঙুলটাকে দেখে তার মনে হয়েছে একটি খাদ্যদ্রব্য। মরণ কামড় বসিয়েছে ডান পায়ের বুড়ো-আঙুলে। আর আমার ডান-পা আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রতিবর্তী-প্রেরণায় আকাশপানে একটা বাইসিক্ল-কিক্ ঝেড়েছে।

তখনও বুঝিনি, অনেক কামড়ের এ শুধু সামান্য একটু ভূমিকা। দু-চার দিনের মধ্যে ওদের দৌরাত্ম্য চরমে উঠ্‌লে। বেতের ঝুড়িটা কেটে-কুটে ফালা-ফালা করে ফেলার পরে বেশ মজবুত ধরনের আর একটা কাঠের খাঁচা বানাতে হল। তিন দিন! তৃতীয় দিনে ওরা থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স ওটাকে ফুটো করে বেরিয়ে এল। তখন আমরা কেউ বাড়ি ছিলাম না। ফলে ওদের স্বেচ্ছাচারে কেউ বাধা দেয়নি। ওরা প্রথমেই ঢুকেছিল—কী শেয়ানা দেখ—আমাদের ভাঁড়ার ঘরে। সেখানে থরে থরে সাজানো থাকে হরেক রকম জীবজন্তুর নানান জাতের খাবার। সব কিছুই চেখে দেখেছে! কিছুই বাদ দেয়নি। যেটা খায়নি সেটা ফেলে ছড়িয়ে ঘরময় মাখামাখি করেছে! দু-ছড়া কলা, গোটা আষ্টেক মুরগির ডিম, এক শিশি ভিটামিন ট্যাবলেট, মায় এক প্যাকেট বরিক পাউডার! মুরগির ডিমের কুসুম সর্বাঙ্গে মেখে ভিজে গায়ে বোরিক পাউডারের বোতলে ঢুকলে তাদের যে খানদানি খোলতাই হবে এটা বোধ হয় তারা জানত না। তা সে যাই হোক, ভাণ্ডার জয় সমাপ্ত করে তারা এবার দিগ্বিজয়ে বার হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য বন্দী জীবজন্তুর তদারকিতে।

আমার সংগ্রহে সেই সময় ছিল একটা আফ্রিকান লোমওয়ালা হনুমান। নিতান্ত নির্বিরোধী ভালোমানুষ। তার নাম রেখেছিলাম : কোলি। সাত্ত্বিক জীব,



কলা-মূলা-ছোলা-মটর খায়, আপন মনে থাকে আর বোধকরি ঊর্ধ্বমুখে পরকালের চিন্তা করে। সে সময় বেচারি আহারান্তে আরামে একটু যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিল। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে—মহাবীরের লাঙ্গুলটি খাঁচার ফোকর দিয়ে নিচে দড়ির আকারে ঝুলছিল। কুসিমাঙ্গি থ্রি-মাস্কেটিয়ার্সের বোধ করি তখনও উদরপূর্তি হয়নি। ঐ দোদুল্যমান লাঙ্গুলটিকে খাদ্যদ্রব্য মনে করে তিন ভাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিয়েছিল মোক্ষম কামড়।

আর যায় কোথায়! কোলি আপ্রাণ চিল্লাচ্ছে যন্ত্রণায়। লাফ দিয়ে সে উঠে বসেছে তার দাঁড়ে। কিন্তু কুসিমাঙ্গিদের ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। কোলির চিৎকার শুনে আমি ততক্ষণে ছুটে এসেছি। দেখি কোলি তার লেজটা প্রবলভাবে দোলাচ্ছে, আর কুসিমাঙ্গি ভাইয়েরা সার্কাসের ট্রাপিজ-খেলোয়াড়ের মত দুলছে। দোল-দোল-দোল দুলুনি! কোলি কিছুতেই ওদের ছাড়াতে পারছে না। আমিও পারি না। শেষে ওদের নাকে-মুখে সিগ্রেটের ধোঁওয়া ছাড়ায় ওরা হাঁচল। কোলি বাঁচল।

দেশে ফিরে আসার আগে ওরা আমাকে পাঁচ-সাতবার কামড়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, লন্ডন-জুতে ওদের পৌঁছে দেবার পর আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। চিড়িয়াখানার ডিরেক্টার বললেন, এ কী? তিনটে কেন ; আমরা তো মাত্র একটি চেয়েছিলাম?

আমি বলি, দুর্লভ জীব! ধরা পড়ল তিনটে। তাই তিনটিকেই নিয়ে এসেছি।

—কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, একটা আপনি নিজে পুষবেন?

সত্যি কথাটা বলিনি। বললাম, সেটা স্বার্থপরতা হত। এমন দুর্লভ জীবকে চিড়িয়াখানাতে রাখাই উচিত। তাহলে সবাই দেখতে পাবে।

উনি খুব খুশি। আম্মো!

* * *

কুসিমাঙ্গির পরে যে জীবটির পিতৃত্বের দায় গ্রহণ করতে হয়েছিল সেটি একটি প্রকাণ্ড পিপীলিকাভুক—জায়েন্ট অ্যান্ট-ঈটার।

সেটা আমাদের হেপাজতে এল নিতান্ত দৈবক্রমে।

সেবার আমি সস্ত্রীক গিয়েছিলাম প্যারাগুয়েতে। একই উদ্দেশ্যে। প্যারাগুয়ে এক বিচিত্র দেশ, দক্ষিণ আমেরিকার ঠিক মধ্যিখানে। সেখানেই থানা গেড়েছিলাম কয়েক মাসের জন্য। নানান জীবজন্তু সংগ্রহ করে প্রায়

একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানাই বানিয়ে ফেলেছি। একাজে নানান ধরনের ঝামেলা বাধে—সেসব কিছু কিছু তোমাদের শুনিয়েছি ; কিন্তু 'রাজনীতি' যে আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা কোনদিন কল্পনাই করিনি। এবার তাই হল। প্যারাগুয়ের মানুষ হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল—তারা একটা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবে। তাতে সরকারের পতন হোক না হোক, বেশ কিছু বিপ্লবী এবং সমাজবিরোধী কয়েদী জেল ভেঙে পালালো। সেই ঢেউ এসে লাগল অস্থায়ী চিড়িখানাতেও। আমরা বিদেশী ; কিন্তু কে শোনে সে-সব কথা! দু দলই বলে, হয় আমাদের দলে এস, না-হলে জাহান্নমে যাও। একসঙ্গে তো বিপক্ষের দু-দলে যোগ দেওয়া চলে না, ফলে জাহান্নমের বদলে স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থাটাই পাকা করতে হল। এমন অবস্থায় এই বিরাট জীবজন্তুর বহর নিয়ে যাওয়া চলে না। এখানেই বা কে তাদের দেখ্‌ভাল করে? অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে 'বর্ন-ফ্রি'দের বনে ছেড়ে আসতে হল। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আর্জেন্টিনাগামী একটি চার আসন যুক্ত ছোট্ট প্লেনে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সীট রিজার্ভ করা গেল।

পরদিন আমাদের প্লেনটা ছাড়বে। জন্তু-জানোয়ারদের তার আগেই জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। সেদিন সারারাত স্বামী-স্ত্রী মিলে আমরা গোছগাছ করলাম। ভোররাতে আমরা রওনা দেব বলে তৈরি হয়ে বসে আছি, এমন সময় একজন স্থানীয় শিকারী সাইকেল চেপে আমাদের তাঁবুতে এসে হাজির। তার কেরিয়ারে একটা চটের থলে। লোকটা সাইকেলটাকে একটা গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে ছুটতে ছুটতে এল। বললে, সমস্ত রাত সাইকেল চালিয়ে এই জঙ্গলের পথটা পাড়ি দিয়েছি স্যার। শুনলাম, আজ সকালেই নাকি আপনারা চলে যাবেন। এই নিন, যা চেয়েছিলেন।

কী আছে ওর থলেতে? কত লোকের কাছেই কত কী বায়না জানিয়ে রেখেছি। এটা চাই, সেটা চাই। তখন কি জানি প্যারাগুয়ের মানুষজন এমন একগুঁয়ে হয়ে বিদ্রোহ করে বসবে? থলের মুখ খুলতেই বার হয়ে পড়ল একটা দুর্লভ জীব—জায়েন্ট অ্যান্ট-ঈটারের একটা বাচ্চা। সপ্তাহখানেকও বয়স হয়নি তার। পূর্ণবয়স্ক একটা ঐ-জাতের পিপীলিকাভুক একটা অ্যালসেশিয়ানের চেয়েও বড় হয়। এটার এখনকার মাপ একটা মাঝারি-সাইজের বেড়ালের মতো।



সূচালো নাক, কুৎকুতে চোখ, সারা গায়ে মখমলের মতো লোম। লোকটা বলল, বাচ্চাটা জঙ্গলে কেঁদে কেঁদে ফিরছিল ; ওর মা-টা বোধহয় জাগুয়ারের পেটে গেছে।

এ কী বিপদ! লোকটা আমার কথার উপর নির্ভর করে এতটা পথ সারারাত-ধরে সাইকেল চালিয়ে এসেছে। ওটাকে নিই-না-নিই দাম দিতে হবে। কিন্তু না নিলে এই মাতৃহীন সদ্যোজাত শিশুটা বাঁচবে কেমন করে? আবার নিতে হলে মালপত্র কমাতে হবে। সেটা অসম্ভব ; কারণ শতখানেক জীবজন্তুকে মুক্তি দিয়ে মাত্র পাঁচ-ছয়টি অতি দুর্লভ জীবকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এ থেকে কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। কী করব বুঝতে পারছি না। ঠিক তখনই এসে গেল স্টেশন ওয়াগনটা—যেটা আমাদের এয়ার-স্ট্রিপে পৌঁছে দেবে। আমরা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

মোটর গাড়ির শব্দে ভয় পেয়েই হোক, অথবা প্রাণধারণের তাগিদে আমাদের মনোভাবটা আন্দাজে বুঝতে পেরেই হোক, বাচ্চাটা এক লাফে এসে পড়ল আমাদের দুজনের মাঝখানে। একবার পর্যায়ক্রমে আমাদের দুজনকে দেখে নিয়ে কী-জানি-কেন বেছে নিল আমার স্ত্রীকে। পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল এবং সবলে জড়িয়ে ধরল তার ডান পায়ের গোছা।

যেন পায়ে ধরে মিনতি করছে : আমাকে ফেলে যেও না!

আমার স্ত্রী ওটাকে কোলে তুলে নিলেন। বিচিত্র হাসলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, টাইপ-রাইটারটা বরং বাদ যাক।

আর্থিক লোকসান সন্দেহ নেই। অ্যান্ট-ঈটারটা বাঁচবে কিনা কে জানে? বাঁচলেও তার বিক্রয়মূল্য ঐ রেমিংটন যন্ত্রটার অর্ধেকও হবে না। হয়তো সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার স্ত্রী চরণাশ্রিত বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার লোমেভরা মাথায় চুমু খাচ্ছেন!

বলা হল না। পিপীলিকাভুকেরই বাজারদর আমার জানা ছিল ; মাতৃস্নেহের বাজারদর কি জানি ছাই? ফলে ঐ লোকটাকেই দিয়ে দিলাম যন্ত্রটা। সে তো তাজ্জব।

জন্তুটাকে নিয়ে প্লেনে করে যেভাবে এসেছি তাতে নিজেই অবাক হই। ড্রপারে করে কত-কত জীবজন্তুকেই তো দুধ খাইয়েছি ; কিন্তু এঁর দুধ খাওয়ার ঢঙটা আবার অন্যরকম। তাতে আবার আমরা অনভ্যস্ত। মায়ের দেহটা মোক্ষম

করে জড়িয়ে না ধরলে মাতৃস্তন্য থেকে দুধ বার হবে না এটাই ওর ধারণা। সেই যে, কী বলে যেন? হ্যাঁ, জন্মগত সংস্কার। তাই খোকন যখন দুদু খাবেন তখন আমার একখানা ঠ্যাঙ তার কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে। তিনি কষে আমার জানুটাকে জড়িয়ে ধরে তবে বোতলে মুখ ছোঁয়াবেন! এদিকে তার প্রচণ্ড বড় বড় নখ। আমার প্যান্ট তো ছার, উরুর চামড়াই ছিঁড়ে গেল। অন্য কোন জীবকে আমরা স্বামী-স্ত্রী পালা করে দুধ খাওয়াতাম ; কিন্তু এঁকে দুধ খাওয়াবার দায় ছিল শুধু আমার। পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিল কুঠারের আঘাতে ; কিন্তু ইনি বোধকরি সেটা করতে চান, যে-কায়দায় ভীম কাৎ করেছিল দুর্যোধনকে! ফলে আমি একাই যন্ত্রণাটা সহ্য করি।

ওখানে পৌঁছেই আমি ঠ্যাঙজোড়াকে মুক্তি দিতে একটা লাঠির গায়ে খড় ও কম্বল জড়িয়ে বিকল্প ঠ্যাঙ বানালাম। 'সারা' সেটাকেই ওর মায়ের দেহ বলে ধরে নিল। ও! বলতে ভুলেছি, ঐ মেয়ে পিপীলিকাভুক্‌টার নামকরণ করেছিলেন আমার স্ত্রী : সারা!

বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই, তাই বলে নামকরণ করবেন না কেন?

বুইনস্ এয়ার্স-এ বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল পরবর্তী জাহাজের জন্য। সেখানে আমাদের অনেক জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধব ছিল। অনেকেই টেলিফোনে খবর পেয়ে সারাকে দেখতে এল। জায়েন্ট-অ্যান্ট-ঈটার সব 'জু'-তে থাকে না। দর্শক পেলে সারা ভারি খুশি। সে দু-চারদিনের মধ্যেই নিজেকে একটা ভি-আই-পি ঠাওরালো। অবশ্য সারার জন্য বন্ধুমহলে আমাদের বদনামও হল কিছুটা। তা তো হতেই পারে। জমাট ডিনার পার্টির মাঝখানে হঠাৎ 'সারা'কে দুধ খাওয়াবার অছিলায় যদি কোনও অতিথি বাড়ি ফিরতে চায়, তাহলে 'হোস্টেস্' তো ক্ষুব্ধ হতেই পারে। বিশেষ, 'তা বাচ্চাটাকে সঙ্গে করেই আনলে পারতে?'—প্রশ্নের জবাবে যদি শুনতে হয়,—'না, সারা আমার মেয়ে নয়, পিপীলিকাভুক'—তখন অবস্থাটা কী দাঁড়ায়?

জাহাজে ফিরতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগবে। 'সারা' জাহাজে চড়ে দারুণ খুশি। কারণ সেই একই। যাত্রীরা তাকে পালা করে দেখতে আসত। দর্শক পেলেই সারার মেজাজ খুশ। নানান কায়দা-কেরামতি সে দেখাতো



দর্শকদের—চিত হয়ে শুয়ে আকাশ আঁচড়ানো, এক হাত লম্বা জিভ বার করে দর্শকদের চম্‌কে দেওয়া অথবা আনন্দের আতিশয্যে তাদের লালাসিক্ত করে দেওয়া।

জাহাজে উঠে প্রথম কদিন খুব ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়েছিল অবশ্য। হঠাৎ কী যে হল, সারা আহার ত্যাগ করে বসল। একেবারে আমরণ অনশন! কিছুতেই বোতলে মুখ দেবে না! কী হল? এমন অনশনের কী কারণ থাকতে পারে? তার মাথায় হাত বুলাই, পেটে সুড়সুড়ি দিই, তার আলিঙ্গনের মধ্যে খড়-জড়ানো লাঠিটা গুঁজে দিই—কিন্তু না! কিছুতেই সে ফিডিং বোতলটায় মুখ দেবে না!

আমাদেরও নাওয়া-খাওয়া ঘুচলো। আমার স্ত্রী বলেন, হঠাৎ কী হল বল তো? অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

অসুখ-বিসুখের কোনও লক্ষণ আমার নজরে পড়েনি। পরিবর্তনের মধ্যে জাহাজের দোলানিটা। কিন্তু তা-ও তো নয়, খাবার সময় ছাড়া সে তো বেশ মনের স্ফূর্তিতে আছে। দোলানির জন্য কষ্ট হলে সে কি দর্শকদের তার কেরামতি দেখাতে অত উদ্‌গ্রীব হতে পারে?

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল। জাহাজে ওঠার আগে ওর বোতলের জন্য একটা নতুন 'টীট' কিনেছিলাম। তাতেই কি....

স্ত্রীকে প্রশ্ন করি, পুরানো টীটটা কোথায়?

উনি রাগ করে বলেন, বুইনস্ এয়ার্সের কোন্ ডাস্টবিনে সেটা ফেলে এসেছি তা ডায়েরিতে লিখে রাখার কথা মনে ছিল না। কেন?

আমার ততক্ষণে বুদ্ধি খুলেছে। বোতল থেকে রবারের টীটটা খুলে নিয়ে সেটাকে বেশ করে কার্পেটে ঘষে নিলাম। বেশ ফাটা-ফাটা রঙচটা পুরানো-পুরানো দেখতে হল। তারপর সেটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আবার বোতলে লাগাই। উনি বলেন, ওটা কী করছ?

আমি জবাব দিইনি। এবার বোতলটা ওর মুখের কাছে ধরতেই একবারে ঝাঁপিয়ে এল। খিদে ছিল প্রচুর। ফলে হাঁ-হাঁ করে খেতে থাকে। ভাবখানা, 'এই তো সেই চেনা মিনি!'

লন্ডন ডক্-এ পৌঁছেই আর এক কাণ্ড! আমরা যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বহু জাতের দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু নিয়ে লণ্ডনে আসছি এটা জানাজানি হয়ে গেছিল।

ওরা তো জানে না, শেষ পর্যন্ত অধিকাংশকেই আবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। যাই হোক, লন্ডন ডক-এ পৌঁছে দেখি, কয়েকজন ক্যামেরাধারী সাংবাদিক আমাদের জন্য প্রতীক্ষারত। বাধ্য হয়ে ইন্টারভ্যু দিতে হল। সেখানেও সারা খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সারাকে পিঠে নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হল ডেক-এ ছবি তোলার জন্য। আমার পিছন থেকে সারার চারটি থাবা ও কাঁধের উপর দিয়ে মুখটুকু বেরিয়ে আছে। অনেকেই ছবি তুলল। একজন ক্যামেরাম্যানের কী দুর্মতি হল—আরও 'ক্লোজআপ' নেবার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর ধারণায় দূরত্বটা যথেষ্ট নিরাপদ! কিন্তু সারার জিহ্বা যে এক হাত লম্বা এ তথ্যটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি সারাকে টিপ করছেন; কিন্তু সারা তার আগেই শাটার টিপল; অর্থাৎ সড়াৎ করে তার এক হাত জিবটা বার হয়ে এল। আর দেখ্-না দেখ্ ক্যামেরাধারীর চশমাটা চলে এসেছে তার মুখে!

আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, সারা তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান দেখাতেই এই কেরামতিটা দেখিয়েছে। এত এত চশমাধারীর মধ্যে শুধুমাত্র তাঁকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোক তাতে কান দিলেন না। গজগজ করতে করতে রুমাল দিয়ে চশমার কাচ দুটো মুছতে থাকেন।

জাহাজঘাটা থেকে সারা সোজা চলে গেল ডিভনশায়ারের এক চিড়িয়াখানায়। আমরা দুজনেই অত্যন্ত মর্মাহত। সারা কিন্তু বেশ মনের ফুর্তিতেই গিয়ে ঢুকল ওর খাঁচায়। ভ্যানের উপর রাখা ছিল সেটা। বেচারি বোধ হয় বুঝতে পারেনি, আমরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তাকে ত্যাগ করেছি।

লন্ডনে পৌঁছাবার পর সারা কেমন আছে, কী খাচ্ছে, ইত্যাদি সংবাদ চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ প্রায়ই আমাকে টেলিফোন করে জানাতেন। সে নাকি বেশ লক্ষ্মী হয়ে আছে। শুনে আমাদের খুশি হবার কথা; উল্টে মনে মনে বলতাম—অকৃতজ্ঞ!

মজা দেখ, যেন সেই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

মাসখানেক পরে 'ফেস্টিভ্যাল হল'-এ আমার একটা বক্তৃতার আয়োজন হল। দক্ষিণ আমেরিকার আরণ্যক-জীবনের উপর স-স্লাইড বক্তৃতা দিতে হবে। কর্মকর্তারা বলেন, ঐ সঙ্গে আপনার ধরে-আনা দু'-একটি প্রাণীকে চাক্ষুষ



দেখাতে পারলে বক্তৃতাটা আরও আকর্ষণীয় হবে। তখনই মনে পড়ল সারার কথা। টেলিফোনে অনুরোধ জানাতে ওঁরা এককথায় রাজি হয়ে গেলেন।

প্যাডিংটন স্টেশনে আমি আর আমার স্ত্রী গিয়েছি সারাকে রিসিভ করতে। সারা ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। প্রায় পাঁচ ফুট! বিশাল এক খাঁচায় তাকে ট্রেনে করে আনা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে সেদিন সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সারাকে দেখতে। আমাদের দেখতে পেয়ে সারাও আনন্দে আত্মহারা। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে অপেক্ষমান ভ্যানে তাকে খাঁচাশুদ্ধ নিয়ে আসা বড় সহজ হল না। কারণ কেউই খাঁচাটাকে ঠেলতে রাজি নয়। তাদের দোষই বা দিই কী করে? তার দেড়-হাত লম্বা জিবকে সবাই ভয় পাচ্ছে। যা হোক, ডবল্ মজুরি কবুল করে কোনক্রমে গাড়িতে তোলা গেল। 'লেকচার হল'-এ নিয়ে এসে তাকে প্রথমে রাখা হল পিছনের ড্রেসিংরুমে। একটু পরেই লোকজন এসে গেল। খাঁচাটাকে স্টেজের পাশেই কুইক-চেঞ্জিং গ্রীনরুমে রেখে আমি বক্তৃতা দিতে মঞ্চে প্রবেশ করলাম। সারার লাফানি-ঝাঁপানিতে তিতিবিরক্ত হয়ে আমার স্ত্রী ওকে খাঁচা থেকে বার করে আদর করতে থাকেন। সারা লম্বায় এখন তার সমান। তার আলিঙ্গনে বেচারি কাবু। আমি এসব জানি না, কারণ আমি তখন মঞ্চের উপর 'দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে'!

হঠাৎ একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটে গেল। কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন হন্তদন্ত হয়ে আমার বক্তৃতায় বাধা দিলেন। আমার কানে কানে বললেন, শিগগির আসুন! হিংস্র জন্তুটা আপনার স্ত্রীকে আক্রমণ করেছে!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নামেই 'জায়েন্ট-অ্যান্টঈটার'। স্বভাবে সে 'জায়েন্ট' বা দৈত্য নয়। আদৌ হিংস্র নয়। তাছাড়া সারা আমার স্ত্রীকে....।

মুশকিল হয়েছে কি, ভদ্রলোক যখন আমার কানে কানে এই গুহ্য বার্তাটি শোনাচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখ ছিল মাইক্রোফোন মাউথ-পিসের কাছাকাছি। ফলে সমস্ত দর্শকমণ্ডলী উত্তেজিত। আমি কী করব, কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। এমন সময়ে মুহূর্তে মুশ্‌কিল-আসান হয়ে গেল। উইংস-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের গোপনবার্তা স্বকর্ণে শুনেছেনও। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি ঐ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই সরাসরি মঞ্চের উপর উঠে এসেছেন। যাকে বলে নাটকীয় প্রবেশ আর কি! সারা তখনও তাঁকে আঁকড়ে শূন্যে ঝুলছে। তিনি এগিয়ে এসে মাইকে

বললেন, আপনারা বিচলিত হবেন না। সারা অনেকদিন পরে তার মাকে দেখতে পেয়ে একটু আদর-সোহাগ জানাচ্ছে মাত্র।

করতালিতে ফেটে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ।

সারার দৃষ্টি ক্ষীণ। ইতিউতি তাকিয়ে সে বুঝতে পারল না এত শব্দ কোথা থেকে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে কোল বদল করে ঝাঁপিয়ে আমার বুকে এল!

সে সন্ধ্যায় সারাই হিরোইন!

সেবার কিন্তু তাকে খাঁচায় বন্দী করে চিড়িয়াখানায় ফেরত পাঠাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের। আগেরবারের অভিজ্ঞতার জন্যই

*সে সন্ধ্যায় সারাই হিরোইন*

হোক, অথবা বয়স বেড়েছে বলেই হোক, এবার সে যেন বুঝতে পেরেছে—বাপ-মায়ের বুক থেকে তাকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

গতকাল আমি চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। ওঁরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সারার একটি সাথীকে সম্প্রতি আমদানি করেছেন। বয়সে সে সারার চেয়ে সামান্য ছোট। তা হোক, সে দ্রুত ডাগরটি হয়ে উঠ্‌ছে। দুটিতে ভাবও হয়েছে।

আশা করছি, এ লেখা ছাপাখানা থেকে বের হয়ে আসার আগে আমি দাদামশাই হয়ে যাব!

---

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com